সুধাংশু পাত্র

পদার্থবিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা



পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১
—জুন, ১৯৮৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫
—মে, ১৯৮৮

প্রকাশক ঃ
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ
দুলালচন্দ্র ঘোষ
নিউ লোকনাথ প্রেস
৮এ কাশীবোস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

দাম ঃ ১৫ টাকা 20/-
(Rupees Fifteen Only.)

পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা

লেখকের অন্যান্য বই

মহাসাগরের মহাবিস্ময়
খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ু
বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
বিজ্ঞানী চরিতকথা
বিজ্ঞানের অমর প্রতিভা
মনের মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্পো
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
ছোটদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী
ভারতের বিজ্ঞান সাধক
বিজ্ঞান চর্চায় প্রাচীন ভারত ও সমকালীন অন্যান্য দেশ
উদ্ভিদ রাজ্যের খবর
পৃথিবী পরিচয়
বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ
জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ
জীবজগতের বিস্ময়
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
বিজ্ঞানের সহজপাঠ
আবিষ্কারের কাহিনী
পৃথিবী মানুষ ও অবকাশ
জীবজন্তুর গপ্পো
জননী কথা
বাংলার বীর বিদ্রোহী

একক সম্বন্ধীয়

* একক কাকে বলে ?

কোন একটি রাশির পরিমাপ বোঝাতে গেলে বিশেষ সুবিধাজনক একটি পরিমাণকে নির্দিষ্ট ধরা হয়। এবং ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণকে মান ধরে সমপ্রকার যে কোন রাশির পরিমাপ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ তথা মানকে বলা হয় একক।

* প্রাথমিক একক ও লব্ধ একক কাদের বলা হয় ?

দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়—এই তিনের একক পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে না। তাই এদের একককে বলা হয় প্রাথমিক একক।

আবার প্রাথমিক একক থেকে অন্যান্য এককও গঠন করা হয়ে থাকে, তাই যে সব একক প্রাথমিক একক থেকে গঠিত হয় তাদেরই বলে লব্ধ একক।

* তিন প্রাথমিক এককদের প্রকাশ করার পদ্ধতিগুলি কি কি ?

১। সি. জি. এস (C.G.S.) বা সেন্টিমিটার, গ্রাম ও সেকেণ্ড পদ্ধতি।

২। এফ. পি. এস (F.P.S.) বা ফুট, পাউণ্ড ও সেকেণ্ড পদ্ধতি।

৩। এম. কে. এস (M.K.S.) বা মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেণ্ড পদ্ধতি।

উপরোক্ত তিন এককের তিনটি শব্দই যথাক্রমে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের নির্দেশক।

বলবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যায় বহুল ব্যবহৃত একক সমূহ

১। দৈর্ঘ্যের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে সেন্টিমিটার।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে ফুট।

২। বর্গক্ষেত্রের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে বর্গ সেন্টিমিটার।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে বর্গ ফুট।

৩। আয়তনের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে ঘন সেন্টিমিটার বা সি. সি. (C.C)।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে ঘন ফুট।

[তরল পদার্থের আয়তন সি. জি. এস পদ্ধতিতে লিটার এবং এফ. পি. এস পদ্ধতিতে গ্যালন ধরা হয়। ১ লিটার = ১০০০ ঘন সেন্টিমিটার এবং ১ গ্যালন = ৪·৫৪ লিটার। ১ ঘন ফুট = ৬·২৫ গ্যালন।]

৪। কোণের একক :—

ডিগ্রী ও রেডিয়ান।

[রেডিয়ানকে ডিগ্রীতে প্রকাশ করলে ১ রেডিয়ান = ৫৭·২৯ ডিগ্রী হয়। ১° (ডিগ্রী) = ৬০´ (মিনিট) এবং ১´ (মিনিট) = ৬০″ (সেকেণ্ড)।]

৫। বেগের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে ফুট/সেকেণ্ড।

এম. কে. এস পদ্ধতিতে মিটার/সেকেণ্ড।

৬। ভরবেগের একক :—[ভরের একক × বেগের একক]

সি. জি. এস পদ্ধতিতে গ্রাম-সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে পাউণ্ড-ফুট/সেকেণ্ড।

এম. কে. এস পদ্ধতিতে কিলোগ্রাম-মিটার/সেকেণ্ড।

৭। ত্বরণের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড সেকেণ্ড।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে ফুট/সেকেণ্ড সেকেণ্ড।

৮। বলের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—ডাইন। (১ গ্রাম ভরের উপর ক্রিয়ায় ১ সে.মি/সেকেণ্ড^{২} ত্বরণ সৃষ্টি করলে।)

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে—পাউণ্ড্যাল। (১ পাউণ্ড ভরের উপর ক্রিয়ায় ১ ফুট/সেকেণ্ড^{২} ত্বরণ সৃষ্টি করলে।)

এম. কে. এস পদ্ধতিতে—নিউটন।

[১ নিউটন = ১ কিগ্রা. মিটার/সেকেণ্ড^{২} = ১০^{৫} ডাইন।]

৯। বলের অভিকর্ষীয় একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—গ্রাম-ভার। (১ গ্রাম-ভার = ৯৮১ ডাইন।)

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে—পাউণ্ড-ভার। (১ পাউণ্ড-ভার = ৩২ পাউণ্ড্যাল।)

১০। চাপের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—ডাইনস্/বর্গ সেমি।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে—পাউণ্ড্যাল/বর্গ ফুট।

আবহবিজ্ঞানে বায়ুচাপের ব্যবহারিক একক—বার। [১ বার = ১০^{৬} ডাইন/বর্গ সেমি.]

১১। ঘাতের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—ডাইন।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে—পাউণ্ড্যাল।

১২। ভ্রামকের (বল × দৈর্ঘ্য) একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—ডাইন-সেন্টিমিটার।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে—পাউণ্ড্যাল-ফুট।

এম. কে. এস পদ্ধতিতে—নিউটন-মিটার।

১৩। কাজের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—ডাইন-সেন্টিমিটার বা আর্গ।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে—ফুট-পাউণ্ড্যাল। (৪.২১৪×১০^৫ আর্গ)

এম. কে. এস পদ্ধতিতে—নিউটন-মিটার বা $১০^৭$ আর্গ বা জুল। (ব্যবহারিক একক)

১৪। শক্তির একক :—(যেহেতু কাজ ও শক্তি একে অন্যে রূপান্তরিত হয় তাই শক্তির একক কাজের এককের অনুরূপ।)

১৫। ক্ষমতার একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—আর্গ / সেকেণ্ড।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে—ফুট-পাউণ্ড্যাল / সেকেণ্ড।

এম. কে. এস পদ্ধতিতে—জুল / সেকেণ্ড বা ওয়াট (W)।

ব্যবহারিক একক—অশ্বক্ষমতা (H.P.)।

[এক অশ্বক্ষমতা = ৫৪০ ফুট-পাউণ্ড / সেকেণ্ড = ৭৪৬ ওয়াট]

১৬। ঘনত্বের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—গ্রাম / $সেমি.^৩$।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে—পাউণ্ড / $ফুট^৩$।

এম. কে. এস পদ্ধতিতে—কিলোগ্রাম / $মিটার^৩$।

১৭। পীড়নের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—ডাইন / $সেন্টিমিটার^২$।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে—পাউণ্ড / $ফুট^২$।

এম. কে. এস পদ্ধতিতে—নিউটন / $মিটার^২$ বা পাস্ক্যাল।

১৮। তাপের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—ক্যালরি।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে—বৃটিশ থার্মাল একক বা B. Th. U.

[১ B. Th. U. = ২৫২ ক্যালরি ; $১০^৫$ B. Th. U = ১ থার্ম]

[এক পাউণ্ড জলের উষ্ণতা ১°F বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ B. Th. U.

একককে এবং ১০০০ পাউণ্ড জলের উষ্ণতা ১০০°F বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপকে থার্মে প্রকাশ করা হয়।]

১৯। তাপমাত্রার একক :—

ডিগ্রী সেলসিয়াস বা ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ডিগ্রী ফারেন-হাইট।

[১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস = ১৮০ ডিগ্রী ফারেনহাইট]

২০। তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্কের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—আর্গ / ক্যালরি।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে—ফুট-পাউণ্ড / B. Th. U.

২১। দীপন শক্তির একক—ক্যাণ্ডেল পাওয়ার (C.P.) এবং ক্যাণ্ডেলা। [পূর্বে দীপন শক্তির একককে "ক্যাণ্ডেল পাওয়ার" ধরা হতো। বিভিন্ন দেশে প্রমাণ বাতি হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন বাতি ধরা হতো বলে আন্তর্জাতিক কাজকর্মে অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে বর্তমানে "ক্যাণ্ডেলা"কে দীপন শক্তির একক ধরা হয়। সাধারণত কোন কৃষ্ণবস্তুকে প্লাটিনামের গলনাঙ্কে অর্থাৎ ১৭৭২° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করলে বস্তুটি থেকে এক বর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে যে দীপ্তি পাওয়া যায় তারই ৬০ ভাগের একভাগকে ক্যাণ্ডেলা ধরা হয়।

অপর পক্ষে ক্যাণ্ডেল পাওয়ার বলতে কোন একটি প্রমাণ দীপের দীপন শক্তির সঙ্গে তুলনা করে যতক্ষণ দীপ্তি প্রকাশিত হয় তাকেই নির্দেশ করে। $\frac{৭}{৮}$ ইঞ্চি ব্যাসের, $\frac{১}{৬}$ পাউণ্ড ওজনের বিশেষ ধরনের মোমের বাতি প্রতি ঘণ্টায় ১২০ গ্রেণ হারে জ্বললে তাকেই প্রমাণ বাতি ধরা হয়। কোন বাতির দীপন শক্তি ৪০০ c. p. বললে বোঝায়, প্রমাণ বাতি অপেক্ষা উক্ত বাতিটির দীপন শক্তি ৪০০ গুণ। ক্যাণ্ডেলার সঙ্গে ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের তুলনা করলে হয়, ১ ক্যাণ্ডেলা = ০·৯৮২ c.p.]

২২। আলোক প্রবাহের (flux of light) একক—লুমেন।

[এক ক্যাণ্ডেলা দীপন শক্তির কোন বিন্দু প্রবহ থেকে প্রতি একক ঘন কোণের ভেতর দিয়ে যে পরিমাণ আলো নির্গত হয় তাকেই বলা হয় লুমেন। ১ ক্যাণ্ডেলা = ৪π লুমেন।]

২৩। দীপন মাত্রার (Illumination) একক :—লাক্স বা মিটার ক্যাণ্ডেল বা মিটার বাতি।

[এক ক্যাণ্ডেলা দীপ্তিমাত্রার কোন একটি বিন্দু প্রভবের চারদিকে এক মিটার ব্যাসার্ধযুক্ত একটা গোলক কল্পনা করলে এবং ঐ গোলকের প্রতি এক বর্গ মিটার স্থানের উপর এক সেকেণ্ডে যে পরিমাণ আলো লম্বভাবে পড়ে তাকেই বিন্দুটির দীপন মাত্রা বোঝায়।]

সি. জি. এস পদ্ধতিতে অর্থাৎ এক বর্গ সেমি. স্থানের উপর যে দীপ্তি প্রবাহ আপতিত হয় তাকে এক সেন্টিমিটার বাতি বা "ফট" ধরা হয়।

এফ. পি. এস পদ্ধতিতে অনুরূপভাবে ধরা হয় ফুট-ক্যাণ্ডেল বা ফুট বাতি।

২৪। ঔজ্জ্বল্যের (Brightness) একক—ক্যাণ্ডেলা / মিটার^২ বা নিট। [আলোক উৎস আকারে বিস্তৃত হলে তার দীপন শক্তিকে "ঔজ্জ্বল্য" দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একক ধরা হয় আলোক প্রভব থেকে প্রতি এক বর্গমিটার ক্ষেত্রফলের উপর দীপ্তি মাত্রার মান।]

২৫। চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্যের একক :—

সি. জি. এস পদ্ধতিতে—ওরস্টেড।

[একটি চৌম্বকক্ষেত্রের কোন এক বিন্দুতে একটি একক মেরু রাখলে যদি ওর উপর এক ডাইন বল প্রযুক্ত হয় তাহলেই চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য হবে এক ওরস্টেড।]

২৬। আধানের স্থির তড়িৎ একক (Electrostatic unit)—ই. এস. ইউ. (e.s. u)।

[যে পরিমাণ তড়িতাধান বায়ুর মাধ্যমে ১ সেমি. দূরে সমপরিমাণ সদৃশ আধানের উপর এক ডাইন বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করে তাকেই

আধানের স্থির তড়িৎ একক ধরা হয়।]

২৭। আলোকের উজ্জ্বলতা পরিমাপের একক—ল্যাম্বার্ট।

[মসৃণ প্রতিফলক তল থেকে আলোকরশ্মি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হলে তারই ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য এই এককটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদি এক ক্যাণ্ডেলা পরিমাণের আলোকপাতে এক বর্গসেমি পরিমিত তল থেকে এক লুমেন আলোক প্রতিফলিত হয় তাহলে তার পরিমাণ হবে এক ল্যাম্বার্ট।]

২৮। তড়িতাধানের (Electric charge) একক :—

ব্যবহারিক একক—কুলম্ব। (১ কুলম্ব = ৩×১০^{৯} e. s. u)

অন্য আর একটি একক—তড়িৎ চুম্বকীয় একক বা e. m. u.।

(১ e. m. u. = ১০ কুলম্ব = ৩×১০^{১০} e. s. u.)

বৃহত্তম একক—ফ্যারাডে। (১ ফ্যারাডে = ৯৬৫০০ কুলম্ব।)

[কুলম্বের সংজ্ঞা—যে পরিমাণ তড়িতাধান সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করালে তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে ০·০০১১১৮ গ্রাম সিলভার ক্যাথোডে জমা হয় তাকেই ধরা হয় ১ কুলম্ব।]

২৯। তড়িৎ বিভবের একক—ভোল্ট। (১ ভোল্ট = $\frac{১}{৩০০}$ e.s.u.)

[এক কুলম্ব ধনাত্মক আধানকে অসীম থেকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোন এক বিশেষ বিন্দুতে আনতে যদি $১০^{৭}$ আর্গস বা এক জুল কাজ করতে হয় তাহলে ঐ বিন্দুতে বিভব প্রভেদ হবে এক ভোল্ট।]

৩০। বিভব প্রভেদের একক—ভোল্ট।

[কোন পরিবাহীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এক কুলম্ব তড়িতাধান পাঠাতে যদি এক জুল কাজ করতে হয় তাহলে ঐ পরিবাহীর উভয় প্রান্তের মধ্যে বিভব প্রভেদ হবে এক ভোল্ট।]

৩১। তড়িৎ ধারকত্বের (Electric Capacity) একক—ফ্যারাড (F)।

১ ফ্যারাড = ৯ × ১০^{১১} e.s.u.

ফ্যারাড সংখ্যাটি বেশ বড় বলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মাইক্রো ফ্যারাড, পিকো ফ্যারাড হিসাবে গণনা করা হয়।

১ মাইক্রো ফ্যারাড = ১০$^{-৬}$ ফ্যারাড।

১ পিকো ফ্যারাড = ১০$^{-১২}$ ফ্যারাড।

[ফ্যারাড—কোন পরিবাহীতে এক কুলম্ব আধান প্রদান করলে যদি ওর বিভব এক ভোল্ট বৃদ্ধি পায় তাহলে ঐ পরিবাহীর ধারকত্ব হবে এক ফ্যারাড।]

৩২। তড়িৎ চালক বলের (Electromotive force বা e.m.f.) একক—ভোল্ট।

৩৩। তড়িৎ প্রবাহের ব্যবহারিক একক—অ্যাম্পীয়ার।

[পরিবাহীর কোন বিন্দু দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ১ কুলম্ব তড়িতাধান প্রবাহিত হলে পরিবাহীটির প্রবাহমাত্রাকে এক অ্যাম্পীয়ার ধরা হয়। ১ অ্যাম্পীয়ার = $\frac{১}{১০}$ e.m.u. = ৩ × ১০^{৯} e. s. u.]

৩৪। রোধের ব্যবহারিক একক = ওহম।

$$(১ \text{ ওহম} = \frac{১ \text{ ভোল্ট}}{১ \text{ অ্যাম্পীয়ার}} = ১০^{৯} \text{ e.m.u.})$$

৩৫। রোধাঙ্কের ব্যবহারিক একক—ওহম-সেমি.।

৩৬। তড়িৎ শক্তির (Electrical energy) ব্যবহারিক একক :—

ক। জুল। [এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যের কোন বর্তনীতে এক অ্যাম্পীয়ার প্রবাহমাত্রা এক সেকেণ্ড ধরে প্রবাহিত হতে থাকলে যে তড়িৎ শক্তি ব্যয়িত হয় তাকেই ধরা হয় জুল। জুল = কুলম্ব × ভোল্ট]

খ। কিলোওয়াট ঘণ্টা বা বোর্ড অব্ ট্রেড ইউনিট. (B.O.T.) [কোন বর্তনীতে এক ঘণ্টা কাল এক কিলোওয়াট বা হাজার ওয়াট হারে তড়িৎ ক্ষমতা ব্যয়িত হলে মোট ব্যবহৃত তড়িৎ শক্তিকে এক কিলোওয়াট ঘণ্টা বা সংক্ষেপে K. W. H বা

B. O. T. ধরা হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহের কোম্পানীগুলি উক্ত একক ব্যবহার করে থাকে। ১ কিলোওয়াট ঘণ্টা = $৩\cdot৬ \times ১০^৬$ জুল।]

৩৭। তড়িৎ ক্ষমতার (Electrical Power) একক—ওয়াট।

[যদি কোন বর্তনীতে এক ভোল্ট বিভব প্রভেদ হয় এবং তাতে এক অ্যাম্পীয়ার প্রবাহমাত্রা বর্তমান থাকে তাহলে ব্যয়িত ক্ষমতার পরিমাণ হবে এক ওয়াট। সুতরাং ওয়াট = ভোল্ট × অ্যাম্পীয়ার। এবং ওয়াট × সেকেণ্ড = জুল।]

৩৮। চৌম্বক ফ্লাক্স এর একক :—

ছোট একক ম্যাক্সওয়েল এবং বড় একক ওয়েবার। দুটিই আন্তর্জাতিক একক। এক ওয়েবার = $১০^৮$ ম্যাক্সওয়েল।

[কোন বর্তনীতে জড়িত চৌম্বক বলরেখা (চৌম্বক ফ্লাক্স) প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ পরিবর্তিত হলে বর্তনীতে মাত্র এক ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেটিক ইউনিট বা e. m. u. তড়িৎ চালক বল উৎপন্ন করে তাকেই বলে ম্যাক্সওয়েল। এবং বর্তনীতে ১ ভোল্ট তড়িৎ চালক বল উৎপন্ন করতে ফ্লাক্সের সেকেণ্ডে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে এক ওয়েবার ধরা হয়।]

৩৯। চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্বের তড়িৎ চুম্বকীয় একক—ওয়েবার/মিটার^২ বা টেসলা।

৪০। সেলফ ইনডাকশান বা স্বাবেশ গুণাঙ্কের একক—হেনরি।

[কোন বর্তনীতে প্রতি সেকেণ্ডে এক অ্যাম্পীয়ার হারে প্রবাহ-মাত্রার পরিবর্তন ঘটলে যদি এক ভোল্ট তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হয় তাহলে বর্তনীটির স্বাবেশ গুণাঙ্ক হবে এক হেনরি।]

৪১। শব্দের কম্পাঙ্কের একক—হার্ৎস।

৪২। শব্দের তীব্রতার একক—ডেসিবেল।

[শব্দের তীব্রতা "বেল" ধরা হয়। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলেক-জাণ্ডার গ্রেহাম বেলের নামানুসারে নামকরণ হয়েছে। কোন

একটি প্রমাণ তীব্রতার সঙ্গে অন্য শব্দের তীব্রতার তুলনা করলে যে অনুপাতটি পাওয়া যায় তার লগকে (log) নিলে "বেল" পাওয়া যায়। বেলের এক দশমাংশই ডেসিবেল।]।

৪৩। জাহাজ চলাচলে ব্যবহৃত জলপথের তথা সামুদ্রিক দূরত্বের মাপ—নটিক্যাল মাইল বা নট।

৪৪। মহাকাশে নক্ষত্রদের দূরত্ব মাপার একক—আলোকবর্ষ।
[আলোকের গতিবেগ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। এক বছরে আলোক যত দূরত্ব অতিক্রম করে তাকেই আলোকবর্ষ ধরা হয়। সুতরাং আলোকবর্ষ=১৮৬০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ মাইল বা ৫.৮৬ × ১০^১২ মাইল।]

৪৫। সমুদ্র জলের গভীরতা মাপার জন্য ব্যবহৃত দৈর্ঘ্যের একক—ফ্যাদম [১ ফ্যাদম = ৬ ফুট]

কতকগুলি যন্ত্রের পরিচয়

১। গোলাকৃতি তলের বক্রতা পরিমাপক যন্ত্র—স্ফেরোমিটার
২। পরিমাপক যন্ত্র—গেজ
৩। সরু তারের ব্যাসার্ধ পরিমাপের যন্ত্র—স্ক্রু গেজ
৪। বায়ুর চাপ মাপক যন্ত্র—ব্যারোমিটার
৫। সঠিক সময় পরিমাপক যন্ত্র—ক্রোনোমিটার
৬। সময়ের অতি-ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পরিমাপক যন্ত্র—ক্রোনোস্কোপ
৭। দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের যন্ত্র—ল্যাকটোমিটার
৮। তরলের ঘনত্ব পরিমাপক যন্ত্র—হাইড্রোমিটার
৯। বায়ুর আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র—হাইগ্রোমিটার
১০। বায়ুমণ্ডলের আনুপাতিক আর্দ্রতা ও আর্দ্রতা হ্রাসবৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র—হাইগ্রোস্কোপ

১১। সাগরের গভীরতা মাপক যন্ত্র—ফ্যাদোমিটার
১২। তরলের পৃষ্ঠটান মাপার যন্ত্র—টেনসিওমিটার
১৩। গ্যাসের আয়তন মাপার যন্ত্র—ইডিয়োমিটার
১৪। বাষ্পীয় চাপ পরিমাপের যন্ত্র—টেনসিমিটার
১৫। সান্দ্রতা পরিমাপের যন্ত্র—ভিস্কোমিটার
১৬। ভূমিকম্প নির্ণয়ের যন্ত্র—সিসমোগ্রাফ
১৭। কোন যানের গতি পরিমাপের যন্ত্র—স্পিডোমিটার
১৮। বায়ুর প্লবতা নির্ণায়ক যন্ত্র—ব্যারোস্কোপ
১৯। বারিপাত মাপক যন্ত্র—রেনগজ
২০। ঘাত সৃষ্টি করার যন্ত্র—হাইড্রোলিক প্রেস
২১। উড়োজাহাজের অথবা কোন স্থানের উচ্চতা মাপক যন্ত্র অল্টিমিটার
২২। বায়ুর গতি পরিমাপের যন্ত্র—অ্যানিমোমিটার
২৩। যে কোন ইঞ্জিনের চাকার ঘূর্ণন সংখ্যা নির্ণয়ের যন্ত্র—ট্যাকোমিটার
২৪। উষ্ণতা মাপক যন্ত্র—থার্মোমিটার
২৫। উদ্ভিদের জীবনীশক্তি বোঝার যন্ত্র—ক্রোস্কোগ্রাফ
২৬। তাপ বিকিরণ পরিমাপের যন্ত্র—রেডিওমিটার
২৭। বিকীর্ণ তাপ পরিমাপক যন্ত্র—বোলোমিটার
২৮। রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গ মাপার যন্ত্র—এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার
২৯। তড়িৎশক্তির গতি পরিবর্তন করানোর যন্ত্র—কমিউটেটর
৩০। পাহাড় পর্বতের ঢালের কোন পরিমাপক যন্ত্র—ক্লিনোমিটার
৩১। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিকিরিত রশ্মির সংগঠক ও কণিকার সংখ্যা নির্ণয়ের যন্ত্র—গাইগার কাউণ্টার
৩২। জলের স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়ের যন্ত্র—হিপসোমিটার
৩৩। বর্ণের উজ্জ্বলতা পরিমাপক যন্ত্র—ক্রোমোমিটার
৩৪। অতি ক্ষুদ্র বস্তুটি বর্ধিত আকারে দৃষ্টিগোচরে আনার যন্ত্র—মাইক্রোস্কোপ

৩৫। দূরের বস্তুকে কাছে দেখার যন্ত্র—টেলিস্কোপ

৩৬। আলোকরশ্মির ঔজ্জ্বল্য তুলনামূলকভাবে
নির্ণয় করার যন্ত্র—ফোটোমিটার

৩৭। কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ প্রদর্শনের যন্ত্র—করোনোগ্রাফ

৩৮। বর্ণালী পরীক্ষার যন্ত্র—স্পেক্ট্রোস্কোপ

৩৯। আলোকশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে
রূপান্তর করার যন্ত্র—ফোটো ইলেকট্রিক সেল

৪০। দিগ্ নির্ণয় যন্ত্র—কম্পাস

৪১। কোন সার্কিটে তড়িৎপ্রবাহ মাপার যন্ত্র—অ্যামমিটার

৪২। অ্যাম্পীয়ার এককে তড়িৎপ্রবাহ মাপার যন্ত্র—অ্যামমিটার

৪৩। তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব নির্দেশ যন্ত্র—গ্যালভানোমিটার

৪৪। ভোল্ট এককে বিভব প্রভেদ মাপার যন্ত্র—ভোল্টামিটার

৪৫। বিভব পার্থক্য পরিমাপক যন্ত্র—পোটেনসিওমিটার

৪৬। উচ্চ তড়িৎ বিভব উৎপন্ন করার যন্ত্র—ভ্যান-ডি গ্রাফ
জেনারেটার

৪৭। যান্ত্রিকশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তর করণের যন্ত্র
—ডায়নামো

৪৮। অল্প শক্তি প্রয়োগ করে বেশী শক্তি লাভের যন্ত্র—লিভার

৪৯। বেতার তরঙ্গের সাহায্যে অনুসন্ধান চালানোর যন্ত্র—রেডার

৫০। কোন কণার বেগ বর্ধনকারী যন্ত্র—অ্যাকসিলারেটার
(সাইক্লোট্রোন, বিভারটন ইত্যাদি)

৫১। বৈদ্যুতিক কম্পন নির্দেশক যন্ত্র—অসিলোস্কোপ

৫২। সূর্যালোকের অদৃশ্য রশ্মির তীব্রতা ও তেজঃশক্তি
পরিমাপক যন্ত্র—অ্যাকটিনোমিটার

৫৩। কোন তরল পদার্থকে বায়ুর চাপে মেঘ বা কুয়াশার মত সূক্ষ্ম
কণায় রূপান্তরিত করণের যন্ত্র—অ্যাটমাইজার

৫৪। ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার যন্ত্র—অ্যাটমিক পাইল

৫৫। তড়িৎ চুম্বকীয় বল—ক্ষেত্রের প্রভাবে কোন পদার্থ থেকে তার ভারী বা হালকা আইসোটোপগুলিকে পৃথক করার যন্ত্র— আইসোট্রম

৫৬। তড়িৎশক্তির অস্তিত্ব নিরূপক যন্ত্র—ইলেকট্রোস্কোপ

৫৭। কোন স্থানের সমতলতা পরীক্ষার যন্ত্র—স্পিরিট লেভেল

৫৮। কোন কিছুর কাঠিন্য পরিমাপক যন্ত্র—স্কেলেরোস্কোপ

৫৯। গ্যাসীয় পদার্থের চাপ নির্ধারক যন্ত্র—ম্যানোমিটার

৬০। চৌম্বকশক্তি পরিমাপক যন্ত্র—ম্যাগনেটোমিটার

৬১। দূরবর্তী কোন বস্তু বা স্থানের কৌণিক ব্যবধান পরিমাপক যন্ত্র—থিয়োডোলাইট

৬২। কোন আবদ্ধ স্থানের বা আধারের উষ্ণতা স্থির রাখার যন্ত্র—থার্মোস্ট্যাট

৬৩। উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপরশ্মি পরিমাপক যন্ত্র— থার্মোপাইল

৬৪। কোন পদার্থের বিভিন্ন সময়ে উষ্ণতার বিভিন্নতা স্বয়ংক্রিয়-ভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য বিশেষ তাপমান যন্ত্র—থার্মোগ্রাফ

স্ট্যাণ্ডার্ড ইণ্টারন্যাশনাল বা

এস. আই (S. I) এককাবলী ঃ—

বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ঐ এককসমূহ এম. কে. এস. একক থেকে নেওয়া এবং সমস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় সি. জি. এস ও এফ. পি. এস সিস্টেমের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এর সাতটি প্রাথমিক একক—

১। মিটার (দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক, চিহ্ন m)

২। কিলোগ্রাম (ভরের একক, চিহ্ন kg)

৩। সেকেণ্ড (সময়ের একক, চিহ্ন s)

৪। অ্যাম্পীয়ার (তড়িৎপ্রবাহের একক, চিহ্ন A)

৫। কেলভিন (উষ্ণতা পরিমাপের একক, চিহ্ন k)

৬। ক্যাণ্ডেলা (দীপ্তিমাত্রা পরিমাপের একক, চিহ্ন cd)

৭। মোল (বস্তুর পরিমাণের একক, চিহ্ন mol)

অপর দুটি অতিরিক্ত এককও আছে। সেগুলি যথাক্রমে (১) রেডিয়ান (কোণ পরিমাপের একক, চিহ্ন rad) এবং (২) স্টেরা-ডিয়ান (ঘণকোণ পরিমাপের একক, চিহ্ন sr)

এছাড়া কতকগুলো লব্ধ একক আছে যাদের নাম ও চিহ্ন উল্লেখ করা হল। চিহ্নগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

(১) বর্গমিটার (m^2) ক্ষেত্রফলের, (২) ঘনমিটার (m^3) আয়-তনের, (৩) হার্ৎস বা HZ (s^{-1}) কম্পাঙ্কের, (৪) নিউটন বা N ($m\ kgs^{-2}$) বলের, (৫) প্যাস্কেল বা Pa (Nm^{-2}) চাপের, (৬) জুল বা J (Nm) কার্য, শক্তি ও তাপের, (৭) ওয়াট বা W (Js^{-1}) ক্ষমতার, (৮) লুমেন বা lm (cdsr) দীপ্তি প্রবাহের, (৯) লাক্স বা lx (lmm^{-2}) দীপনমাত্রার, (১০) কেলভিন ($Jkg^{-1}k^{-1}$) আপেক্ষিক তাপের, (১১) ওয়াট / মি. ($Wm^{-1}k^{-1}$) তাপ পরি-বাহিতার, (১২) কুলম্ব C (As) তড়িতাধানের, (১৩) ভোল্টা (wa^{-1}) বিভব প্রভেদের, (১৪) ওহম π (va^{-1}) রোধের, (১৫) সিমেনস S (π^{-1}) তড়িৎপরিবাহিতার, (১৬) ফ্যারাড F (cv^{-1}) তড়িৎ ধারকত্বের, (১৭) ওয়েবার Wb (vs) চৌম্বক ফ্লাক্সের, (১৮) টেসলা T (wbm^{-2}) ফ্লাক্স ঘনত্বের, (১৯) হেনরী H (rs) আবেশাঙ্কের, (২০) অ্যাম্পীয়ার/মিটার (Am^{-1}) চৌম্বকক্ষেত্রের তিব্রতার, (২১) ফ্যারাড/মিটার (Fm^{-1}) পরা তড়িৎ ধ্রুবকের, (২২) হেনরী/মিটার (Hm^{-1}) চৌম্বক ভেদ্যতার।

মুল এককের কয়েকটি উপপদ (Prefix), উপপদসমূহের গুণনীয়ক এবং বন্ধনীর মধ্যে চিহ্ন প্রদান করা হল।

বৃহত্তরদের :—

10 ডেকা (Da), 10^2 হেক্টো (H), 10^3 কিলো (K), 10^6

মেগা (M), 10^{9} গিগা (G), 10^{12} টেরা (T), 10^{15} পেটা (P) এবং 10^{18} এক্সা (E)

ক্ষুদ্রতরদের :—

10^{-1} ডেসি (d), 10^{-2} সেন্টি (c), 10^{-3} মিলি (m), 10^{-6} মাইক্রো (μ), 10^{-1} ন্যানো (n), 10^{-12} পিকো (p), 10^{-15} ফেমটো (f) এবং 10^{-18} অটো (a)

কতকগুলি এককের পারস্পরিক সম্পর্ক—

১ মিটার = ৩৯·৩৭০১ ইঞ্চি = ৩·২৮০৮৪ ফুট = ১·০৯৩৬১ গজ।

১ সেমি = ০·৩৯৩৭০১ ইঞ্চি = ০·০৩২৮০৮৪ ফুট = ০·০১০৯৩৬১ গজ।

১ ইঞ্চি = ২·৫৪ সেমি = ০·০২৫৪ মিটার

১ ফুট = ৩০·৪৮ সেমি = ০·৩০৪৮ মিটার

১ কিলোমিটার = ০·৬২১৩৭১ মাইল

১ মাইল = ১·৬০৯৩৪ কিমি।

১ আলোকবর্ষ = ৯·৪৬০৭০ × ১০^{১৫} মিটার = ৫·৮৭৮৪৮ × ১০^{১২} মাইল

১ বর্গ মিটার = ১০^{৪} বর্গ সেমি = ১৫৫০ বর্গ ইঞ্চি = ১০·৭৬৩৯ বর্গ ফুট = ১·১৯৫৯৯ বর্গ গজ = ৩·৮৬০১৯ × ১০$^{-৭}$ বর্গ-মাইল।

১ বর্গ ফুট = ৯২৯·০৩ বর্গ সেমি = ৯·২৯০৩ × ১০$^{-২}$ বর্গ মিটার

১ বর্গ কিলোমিটার = ১০^{৬} বর্গ মিটার = ১·১৯৫৯৯ × ১০^{৬} বর্গ গজ = ০·৩৮৬০১৯ বর্গ মাইল

১ বর্গ গজ = ০·৮৩৬১২৭ বর্গ মিটার = ৮·৩৬১২৭ × ১০$^{-৭}$ বর্গ কিলোমিটার

১ বর্গ মাইল = ২·৫৮৯৯৯ × ১০^{৬} বর্গ মিটার = ২·৫৮৯৯৯ বর্গ কিলোমিটার

১ ঘন মিটার = $১০^{৬}$ ঘন সেমি = $৬·১০২৩৬ \times ১০^{৪}$ ঘন ইঞ্চি =৩৫·৩১৪৬ ঘন ফুট=২১৯·৯৬৯ গ্যালন

১ ঘন সেমি = $১০^{-৬}$ ঘন মিটার = ০·০৬১০২৩৬ ঘন ইঞ্চি =$৩·৫৩১৪৬ \times ১০^{-৫}$ ঘনফুট = $২·১৯৯৬৯ \times ১০^{-৪}$ গ্যালন

১ ঘন ফুট = ০·০২৮৩১৬৮ ঘন মিটার = ২৮৩১৬·৮ ঘন সেমি =৬·২২৮৮২ গ্যালন

১ মিটার/সেকেণ্ড=৩·৬ কিমি/ঘণ্টা = ২·২৩৬৯৪ মাইল/ঘণ্টা =৩·২৮০৮৪ ফুট/সেকেণ্ড

১ ফুট/সেকেণ্ড = ০·৩০৪৮ মিটার/সেকেণ্ড = ১·০৯৭২৮ কিমি/ঘণ্টা = ০·৬৮১৮১৭ মাইল/ঘণ্টা

১ নট = ১ নটিক্যাল মাইল/ঘণ্টা = ০·৫১৪৪৪৪ মিটার/সেকেণ্ড

১ নিউটন = ০·১০১৯৭২ কিগ্রা = $১০^{৫}$ ডাইন = ৭·২৩৩০০ পাউণ্ড্যাল = ০·২২৪৮০৯ পাউণ্ড

১ ডাইন = $১০^{-৫}$ নিউটন = $১·০১৯৭২ \times ১০^{-৪}$ কিগ্রা =$৭·২৩৩০০ \times ১০^{-৫}$ পাউণ্ড্যাল = $২·২৪৮০৯ \times ১০^{-৬}$ পাউণ্ড

১ পাউণ্ড্যাল = ০·১৩৮২৫৫ নিউটন = ·০৪৫৩৫৯২ কিগ্রা = $৪·৪৪৮২৩ \times ১০^{৫}$ ডাইন

১ প্যাস্কেল = ১ নিউটন / বর্গ মিটার = ১০ ডাইন / বর্গ সেমি।

১ বার = $১০^{৫}$ নিউটন/বর্গ মিটার = ০·৯৮৬৯২৩ বায়ুমণ্ডলের চাপ

১ জুল = ·২৩৮৮৪৬ ক্যালরি = $২·৭৭৭৭৮ \times ১০^{-৭}$ কিলোওয়াট ঘণ্টা

১ ক্যালরি = ৪·১৮৬৮ জুল = $১·১৬৩০০ \times ১০^{-৬}$ কিলোওয়াট ঘণ্টা

১ ইলেকট্রন ভোল্ট = $১·৬০২১০ \times ১০^{-১৯}$ জুল

বিজ্ঞানে বহুলভাবে ব্যবহৃত কয়েকটি গ্রীক অক্ষর ও তাদের উচ্চারণ

α (আলফা), β (বিটা), γ (গামা); δ (ডেলটা),
ϵ (এপসিলন), ζ (জিটা), η (ইটা), θ (থিটা),
k (ক্যাপা), λ (ল্যামডা), μ (মিউ), ξ (জাই),
π (পাই), ρ (রো), σ (সিগমা), u (আপসিলন),
ϕ (ফাই), ψ (সাই), ω (ওমেগা)।

কয়েকটি ধ্রুবক, তাদের প্রতীক ও আন্তর্জাতিক মান S. I একককে—

১। শূন্যে আলোর গতিবেগ (c) = ২·৯৯৭৯ × ১০^{৮} ms^{-1}
২। ইলেকট্রনের আধান (e) = ১·৬০২১৯২ × ১০^{১৯} c
৩। ইলেকট্রনের স্থির ভর (me) = ৯·১০৯৫৫৮ × ১০$^{-৩১}$ কিগ্রা
৪। ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ (re) = ২·৮১৭৭৭ × ১০$^{-১৫}$ মিটার
৫। প্রোটনের স্থির ভর (mp) = ১·৬৭২৬১৪ × ১০$^{-২৭}$ কিগ্রা
৬। নিউট্রনের স্থির ভর (mn) = ১·৬৭৪৯২ × ১০$^{-২৭}$ কিগ্রা
৭। প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক (h) = ৬·৬২৬১৯৬ × ১০$^{-৩৪}$ Js.
৮। গ্যাস ধ্রুবক (R) = ৮·৩১৪৩৪ Jk^{-1} mol^{-1}
৯। বোলোৎস মান ধ্রুবক ($k = \frac{R}{N_A}$) = ১·৩৮০৬২২ × ১০$^{-২৩}$ J k^{-1}
১০। ফ্যারাডে ধ্রুবক (F) = ৯·৬৪৮৬৭০ × ১০^{৪} c mol^{-1}
১১। ষ্টিফান বোলোৎ সমান ধ্রুবক (σ) = ৫·৬৬৯৭ × ১০$^{-৮}$ w m$^{-২}$ k^{৪}
১২। অবাধ পতনের ত্বরণ (g) = ৯·৮০৬৬৫ m s$^{-২}$
১৩। মহাকর্ষ ধ্রুবক (G) = ৬·৬৬৪ × ১০$^{-১১}$ N m^{২} kg$^{-২}$

কতকগুলি নামের সংক্ষেপ—

অ্যাটমিক নাম্বার At. No, অ্যাটমিক ওয়েট A.W., বয়েলিং

পয়েন্ট b.p., ফ্রিজিং পয়েন্ট f.p., মেল্টিং পয়েন্ট m.p., রিলেটিভ ডেনসিটি r.d.

প্রশ্ন : (বলবিদ্যা)

* পদার্থ কাকে বলে ?

যাকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারি, যার নিজস্ব সত্তা ও ওজন আছে, তাকে বলা হয় বস্তু। আর বস্তু যে উপাদানে গঠিত তাকেই বলা হয় পদার্থ।

* শক্তি কি ?

যে কোন বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকেই শক্তি বোঝায়।

* পদার্থ কোন্ কোন্ অবস্থায় থাকে ?

পদার্থ সাধারণত কঠিন, তরল ও বায়বীয়—এই তিন অবস্থায় থাকে। তবে কোন অবস্থাই পদার্থের স্থায়ী রূপ নয়। তাপ প্রয়োগ অথবা হ্রাস করলে বস্তুর অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে।

* প্লাজমা অবস্থা কি ?

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, পদার্থের উপরোক্ত তিন অবস্থা ছাড়াও আর এক অবস্থা থাকতে পারে। প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে গ্যাস যদি আয়নিত হয়ে যায় এবং তার ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানসমূহ পাশাপাশি অবস্থান করে তখন গ্যাসকে পরীক্ষা করলে সম্পূর্ণরূপে তড়িৎ নিরপেক্ষ বলে মনে হবে। এই অবস্থাই পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বা প্লাজমা।

* পদার্থের কি সৃষ্টি অথবা ধ্বংস হয় ?

না। কেবলমাত্র রূপান্তরই হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সৃষ্টির আদিতে যে পরিমাণ পদার্থ ছিল, আজও ঠিক সেই পরিমাণ পদার্থই আছে। কেবল রূপান্তর হয়েছে মাত্র।

* মোমবাতিকে পুড়িয়ে ফেললে নিঃশেষ হয়ে যায়—এক্ষেত্রে কি রূপান্তর ঘটে ?

হ্যাঁ। মোমবাতি যখন জ্বলতে থাকে তখন মোমের উপাদানগুলি

বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন করে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প। এগুলি যেহেতু গ্যাস তাই আমরা দেখতে পাই না এবং এরা বায়ুর সঙ্গেই মিশে যাচ্ছে। মোমবাতির দহনের সময় গ্যাস-গুলিকে যদি সংরক্ষণ করে ওজন করা যায় তাহলে দেখা যাবে ওজন বেড়ে গেছে। অক্সিজেন যুক্ত হওয়ার জন্যই বেড়ে যায় এবং অক্সিজেনকে বাদ দিলে মোমবাতির পূর্বের ওজন পাওয়া যাবে।

* শক্তিকে মোট ক'টি ভাগে ভাগ করা হয় এবং কি কি ?

সাত ভাগে ভাগ করা হয়। বিভাগগুলি ১। যান্ত্রিক শক্তি ২। তাপ শক্তি ৩। আলোক শক্তি ৪। শব্দ শক্তি ৫। চৌম্বক শক্তি ৬। তড়িৎ শক্তি এবং ৭। রাসায়নিক শক্তি।

* স্কেলার রাশি ও ভেক্টর রাশি কাদের বলা হয় ?

যাদের প্রকাশ করতে শুধু মান দরকার হয় কিন্তু দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না তাদের বলা হয় স্কেলার রাশি এবং যাদের প্রকাশ করতে মান ও দিক নির্দেশ উভয়েরই প্রয়োজন হয় তাদের বলে ভেক্টর রাশি। যেমন সময়, ভর ইত্যাদি স্কেলার ও ত্বরণ, ওজন প্রভৃতি ভেক্টর।

* শক্তির রূপান্তর কি ?

পদার্থের মত শক্তিরও ক্ষয় নেই। অর্থাৎ কোন নতুন শক্তি সৃষ্টি করা যায় না বা শক্তির ধ্বংসও হয় না। কেবলমাত্র এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আরও সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, কোন বস্তু যে পরিমাণ শক্তি হারায় অন্য বস্তু ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি লাভ করে। পদার্থের মতই বিশ্ব সৃষ্টির আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে।

* অশ্বশক্তি কথাটি প্রথমে কে ব্যবহার করেন ?

জেমস ওয়াট।

* বায়ুপাম্প কে আবিষ্কার করেন ?

অটো ফন গেরিক।

* ভার্নিয়ার স্কেল কি এবং কে আবিষ্কার করেন ?

সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য মাপার স্কেল এবং আবিষ্কার করেন পি. ভার্নিয়ার।

* ত্বরণ কাকে বলে ?

যখন কোন বস্তুকণা ক্রমবর্ধমান বেগ নিয়ে চলতে থাকে তখন তার বেগ পরিবর্তনের হারকে বলে ত্বরণ।

* ত্বরণে সময়ের একক দুবার ব্যবহার করা হয় কেন ?

একবার বেগ এবং আরেকবার বেগ পরিবর্তনের হার বোঝাতে দুবার ব্যবহার করা হয়।

* ঋণাত্মক ত্বরণ কাকে বলে ?

মন্দনকে বলা হয় ঋণাত্মক ত্বরণ।

* অভিকর্ষ কাকে বলে ?

পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ তাকেই বলে অভিকর্ষ।

* অভিকর্ষজ ত্বরণ কি ?

কোন বস্তুর উপর যদি কোন বল ক্রিয়া করে তাহলে বস্তুটির গতি ত্বরান্বিত হয়। অর্থাৎ বস্তুতে একটি ত্বরণ সৃষ্টি হয়। তাই অভিকর্ষ বলের ক্রিয়ায় কোন বস্তু পৃথিবীর দিকে এলেও তার ত্বরণ সৃষ্টি হয় উক্ত ত্বরণকেই বলা হয় অভিকর্ষজ ত্বরণ।

* মহাকর্ষ কাকে বলে ?

বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করছে। এই আকর্ষণ বলকে বলা হয় মহাকর্ষ। বলাবাহুল্য, মহাকর্ষ বল প্রতিটি বস্তুর মধ্যে নিহিত। দুটি বস্তুকণাকে নিয়ে যদি বিচার করা যায় তাহলে ঐ আকর্ষণ বল কণাদ্বয়ের সংযোগকারী সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে। এবং এর মান কণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং পারস্পরিক দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতী।

* সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহরা ঘুরছে কেমন করে ?

বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আছে আকর্ষণ বল এবং কিছু না কিছু গতিবেগ। ছোট ও বড় দুটি বস্তুপিণ্ডকে নিয়ে বিচার করলে দেখা

যাবে, দুটিই দুটিকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে। দূরত্ব বেশী না হলে ছোটটি বড়টির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে এবং দূরত্ব বেশী হলে আকর্ষণ বল ক্ষীণ হয়ে পড়ে বলে বড়টির চারদিকে ছোটটি পাক খেতে খেতে ঘুরতে থাকবে। সূর্য সুবৃহৎ জ্যোতিষ্ক এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহরা সেই অনুপাতে অনেক ছোট। ওদের সম্মিলিত ভরকেন্দ্রটি সূর্যদেহে বিদ্যমান। তাই ভরকেন্দ্রের চারদিকে গ্রহরা আপন মেরুদেশ অবলম্বনে পাক খেতে খেতে পরিভ্রমণ করতে থাকে। ঐ একই কারণে উপগ্রহরাও ঘুরতে থাকে গ্রহের চারদিকে।

* মহাকর্ষ ধ্রুবক কি এবং তার মান কত?

যদি r দূরত্বে দুটি বস্তুকণার ভর যথাক্রমে m_1 ও m_2 হয় এবং মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল যদি F হয় তাহলে $F \propto m_1 . m_2$ এবং $F \propto \frac{1}{r^2}$ হবে। সমন্বয় করলে হয় $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$।

এখানে G ধ্রুবক এবং এই ধ্রুবককে বলা হয় মহাকর্ষ ধ্রুবক। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে ধরা হয়েছে Gর মান $= ৬{\cdot}৬৭ \times ১০^{-৮}$ ডাইন-সেমি^{২}/গ্রাম^{২}।

* কোন স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

সরল দোলকের সাহায্যে। দোলকের দোলনকাল যদি T হয় এবং কার্যকর দৈর্ঘ্য যদি L হয় তাহলে অভিকর্ষজ ত্বরণ $g = 4\pi^2(L/T^2)$ হবে।

* অভিকর্ষজ ত্বরণের মান পৃথিবীতে কোথায় বেশী এবং কোথায় কম?

ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূপৃষ্ঠের অল্প গভীরে অভিকর্ষীয় ত্বরণের মান সর্বাধিক। অভ্যন্তরে একেবারে পৃথিবীর কেন্দ্রে এই মান শূন্য। তেমনই ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কমতে থাকে। তাই ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা পর্বতশীর্ষে উক্ত মান কম হয়।

* প্রস্থান বেগ বা এসকেপ ভেলোসিটি কাকে বলে?

পৃথিবী তার উপরিভাগের প্রতিটি বস্তুকণাকে আকর্ষণ বলের দ্বারা

ধরে রেখেছে। সেই আকর্ষণ বলকে উপেক্ষা করে কোন কিছুর বাহিরে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। উক্ত কারণে গাছের পাকা ফল মাটিতে পড়ে, ঢিল ছুঁড়লে পুনরায় ফিরে আসে মাটির বুকে।

কিন্তু দেখা গেছে, কোন বস্তু যদি সেকেণ্ডে সাত মাইল গতিবেগ নিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ ত্যাগ করে তাহলে সে আর ফিরে আসে না। অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণের আওতা থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ করে। উক্ত বেগকে প্রস্থান বেগ বা মুক্তিবেগ বা এসকেপ ভেলোসিটি বলে।

* কোন বস্তুর উপর থেকে নিচে অবাধ পতনের সূত্রগুলি কি কি?

১। কোন বাধা না থাকলে ভারি কিংবা হালকা যে কোন বস্তু সমান দ্রুততায় ভূমি স্পর্শ করে, ২। নির্দিষ্ট সময়ে পতনশীল বস্তু যে বেগ লাভ করে তা তার অতিক্রান্ত সময়ের সমানুপাতী এবং ৩। নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা তার অতিক্রান্ত সময়ের বর্গের সমানুপাতী।

* বায়ুশূন্য স্থানে উপর থেকে একটি মুদ্রা এবং একটি পালক নিক্ষেপ করলে কোনটি আগে ভূমি স্পর্শ করবে?

বায়ুর প্রতিবন্ধক না থাকায় দুটি একসঙ্গে ভূমি স্পর্শ করবে।

* পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হঠাৎ বন্ধ হলে কি হবে?

পৃথিবীর উপরিভাগের সবকিছু জিনিস ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

* গ্রহ উপগ্রহের গতি সম্পর্কে কেপলারের সূত্রগুলি কি কি?

১। প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে ফোকাসে রেখে এক উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমা করে।

২। সূর্য এবং গ্রহকে যুক্ত করলে যে সরলরেখা পাওয়া যাবে সেই সরলরেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করতে থাকে।

৩। সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তনরত গ্রহের আবর্তন কালের বর্গ কক্ষপথের পরাক্ষ (Major axis) তথা বৃত্তাকার কক্ষপথের ব্যাসের ঘনফলের সমানুপাতী।

* রকেট উৎক্ষেপনের মূলনীতি কি?

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র। সূত্রটি হল "প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে।" রকেট ইঞ্জিনের মধ্যে জ্বালানীর দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস উৎপন্ন হয়। একমাত্র নির্গমনের নালীপথ ধরে যখন গ্যাসগুলি প্রবল বেগে বাহিরে বেরিয়ে আসতে থাকে তখন বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারই ফলে রকেট হয় উর্ধমুখী।

* কৃত্রিম উপগ্রহকে কেমন করে পৃথিবী কক্ষে স্থাপন করা হয়?

এর পেছনে আছে বিরাট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ব্যবস্থার সমন্বয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, পৃথিবীর মুক্তিবেগের কিছু কম গতিবেগ নিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহকে মাথায় স্থাপন করে রকেটই নিয়ে যায় মহাকাশে। এবং একটি বিশেষ দূরত্বে তথা পৃথিবীর কক্ষে রেখে আসে।

* পৃথিবী কক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহকে পরিভ্রমণ করানোর জন্য কি কোন বল প্রয়োগ করতে হয়?

না। কেবলমাত্র পৃথিবীর আকর্ষণের প্রভাবেই অর্থাৎ মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে চলতে থাকে।

* কৃত্রিম উপগ্রহের অভ্যন্তরে মহাকাশচারী কক্ষপথে চলাকালে নিজেকে ভারহীন মনে করে কেন?

মানুষের ভর যদি m হয় এবং পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণ যদি g হয় তাহলে মানুষের ওজন হয় mg। ভূত্বকের দ্বারা উৎপন্ন এই ওজন বা অভিকর্ষ বলের প্রতিক্রিয়ার জন্য আমরা ওজন অনুভব করি। কিন্তু কোন ভার g ত্বরণ সৃষ্টি করলেও যদি তা কোন ভাবে প্রতিহত না হয় তবে ভার অনুভূতি হবে না।

কৃত্রিম উপগ্রহ যখন কক্ষপথে চলতে থাকে তখন উপগ্রহ এবং তার আরোহী উভয়েরই g ত্বরণ হয়। ত্বরণের পার্থক্য না থাকায় প্রতিঘাত সৃষ্টি সম্ভব নয়। অর্থাৎ উপগ্রহ ও মানুষের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সিস্টেম নাই। এই কারণেই মহাকাশচারী ভার শূন্যতা অনুভব করে।

এ একই কারণে কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে কোন বস্তু ছেড়ে দিলে সেটি সেই জায়গায় ভাসতে থাকবে। এমনকি জলের গ্লাসকে উপুড় করে ধরলেও জল পড়বে না।

* লিফটের দড়ি ছিঁড়ে গেলে লিফট নামার সময় আরোহী ভারহীন অনুভব করে কেন ?

লিফটের দড়ি ছিঁড়ে গেলে লিফট আরোহীসমেত g ত্বরণে নামতে থাকে। এই অবস্থায় আরোহীর ওজন লিফটের উপর কোন ক্রিয়াই করতে পারে না। কাজেই প্রতিক্রিয়াও সম্ভব নয়। তাই সে ভারহীনতা অনুভব করে।

* চাঁদে গেলে অভিযাত্রীদের হালকা মনে হয় কেন ?

চাঁদের অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণের ছয়ভাগের একভাগ মাত্র। তাই চাঁদে নিজের ওজন কমে গেছে মনে হয়।

* কোন বস্তুর ওজন বলতে কি বোঝায় ?

কোন বস্তুর উপর পৃথিবী মোট যে অভিকর্ষজ বল প্রয়োগ করে তাকেই বলা হয় ওজন।

* কোন বস্তুকে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় ওজন করলে ওজনের মান কি সমান হবে ?

না। কোন স্থানের অভিকর্ষজ ত্বরণের মান পৃথিবী কেন্দ্র থেকে ঐ স্থানের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতী। তাই পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যত দূরে বস্তুটিকে নিয়ে যাওয়া হবে ততই তার ওজন কমতে থাকবে। কিন্তু মেরুদ্বয়ে ওজন নিরক্ষরেখায় ওজন অপেক্ষা বেশীই হবে। কারণ, মেরুদ্বয় কিছুটা চাপা। পৃথিবী কেন্দ্র থেকে নিরক্ষরেখার যে দূরত্ব, সেই দূরত্ব অপেক্ষা মেরুর দূরত্ব কম।

* বস্তুর ওজনের তারতম্য কি সাধারণ তুলার সাহায্যে নির্ণয় করা যায় ?

না। সাধারণ তুলায় যে বাটখারা ব্যবহার করা হয় তার দ্বারা কোন বস্তুর তুলনামূলকভাবে ভর মাপা যায় মাত্র। অথচ ভরকে সেই স্থানের অভিকর্ষজ ত্বরণ দিয়ে গুণ করলে ওজন পাওয়া যায়। স্থানান্তরে

অর্থাৎ পর্বতশীর্ষে কিংবা মেরুদেশে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন হয় বলে প্রকৃত ওজন সাধারণ তুলার সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না।

* ওজন নিভু্লভাবে নির্ণয় করার যন্ত্রের নাম কি ?

স্প্রিং তুলা।

* স্থির গাড়ী হঠাৎ চলতে আরম্ভ করলে আরোহী পেছনের দিকে এলিয়ে পড়ে কেন ?

বাহির থেকে কোন বল প্রযুক্ত না হলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকতে চায় এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল গতিশীল থাকতে চায়। অর্থাৎ জড়তা বস্তুর একটি ধর্ম। গাড়ী যখন স্থির অবস্থায় থাকে তখন জড়তার সূত্র অনুযায়ী আরোহীও স্থির ছিল। হঠাৎ গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে আরোহীর শরীরের নিম্নভাগ গাড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন থাকায় গতিশীল হয়ে উঠে কিন্তু উপরের দিকটা জড়তার দরুণ স্থির অবস্থায় থাকতে চেষ্টা করে। ফলে আরোহী পেছনের দিকে এলিয়ে পড়ে।

* চলন্ত গাড়ী থেকে নামলে আরোহী সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেন ?

গাড়ী যখন চলতে থাকে তখন আরোহীর সমস্ত দেহটাই থাকে গতিশীল। চলন্ত গাড়ী থেকে নামলে মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের নিম্নাংশ স্থির হলেও দেহের উর্ধ্বাংশ গতি বজায় রাখতে চেষ্টা করে। উক্ত কারণে আরোহী মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাই গাড়ী না থামা পর্যন্ত আরোহীর অপেক্ষা করা উচিত। গাড়ির গতি মন্দীভূত হলে যদি নিতান্তই নামতে হয় তাহলে নেমে কয়েক পা ছুটে যাওয়া উচিত।

* যখন রেলগাড়ী নির্দিষ্ট গতিবেগ নিয়ে ছুটতে থাকে তখন কোন আরোহী যদি কামরা থেকে একটি বলকে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারে তাহলে গাড়ী এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বলটি আরোহীর হাতে ফিরে আসে কেন ?

গতি জাড্যের দরুণ বলটা সমান গতিবেগ লাভ করে বলে বল বাহিরে ছুঁড়ে হাত পেতে রাখলে বলটি আরোহীর হাতে ধরা পড়ে।

* রেল গাড়ীতে বসলে গাছপালাকে বিপরীত দিকে ছুটতে দেখা যায় কেন ?

গতি ও স্থিতির ধারণা আপেক্ষিক। গাড়ীর সঙ্গে গতিশীল দর্শক নিজেকে স্থিরভাবে এবং তার চারদিকের বস্তুরাশিকে দর্শকের গতিতে গতিশীল দেখে।

* আমরা রেলগাড়ীতে চড়লে গাছগুলোকে বিপরীত দিকে ছুটতে দেখি কিন্তু আকাশের তারাদের একই দিকে ছুটতে দেখি কেন ?

ট্রেন থেকে যে গাছপালা, খুঁটি, বাড়ী ইত্যাদিকে বিপরীত দিকে ছুটতে দেখি তাদের থেকে আকাশের নক্ষত্ররা অনেক—অনেক দূরবর্তী। যাদের দূরত্ব যত কম তাকে তত বেশী জোরে বিপরীত দিকে ছুটতে দেখা যায়। উক্ত কারণে কাছের গাছপালা যত দ্রুত এগিয়ে যায় দূরের গাছপালা তত দ্রুত সরে যায় না। এক্ষেত্রে দ্রুততা ট্রেন অপেক্ষা বস্তুটির কৌণিক অবস্থান পরিবর্তনের হারের উপর নির্ভর করে। ট্রেন থেকে যে বস্তুর দূরত্ব যত কম ট্রেন থেকে বস্তুটির কৌণিক অবস্থান পরিবর্তনের হার তত বেশী। কিন্তু দূরত্ব বাড়লে পরিবর্তনের হারও কমতে থাকে। আকাশের চাঁদ, নক্ষত্র প্রভৃতি এত দূরে আছে যে ওদের ক্ষেত্রে কৌণিক অবস্থান পরিবর্তনের হার একেবারে নগণ্য বলা যেতে পারে। তাই এরা গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকেই ধাওয়া করে। অতি দূরে অবস্থানকারী গাছপালার ক্ষেত্রেও অনুরূপ মনে হবে।

* প্লবতা কাকে বলে ?

কোন বস্তুকে তরলে নিমজ্জিত করলে তরল যে উর্ধ্বমুখী ঘাত প্রয়োগ করে তাকেই বলা হয় প্লবতা।

* কোন ভারী বস্তুকে কোন তরলে নিমজ্জিত করলে তার ওজনের হ্রাস হয়েছে মনে হয় কেন ?

কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে তরলে নিমজ্জিত করলে বস্তুটি সমান আয়তনের তরলকে অপসারিত করে। আর তখনই বস্তুটি একটি ঊর্ধ্বমুখী ঘাত অনুভব করে। ঐ ঘাতের পরিমাণই হচ্ছে অপসারিত সমআয়তনের তরল। তাই বস্তু কর্তৃক যতখানি তরল অপসারিত হয় বস্তুর ওজন ঠিক ততটা কমেছে বলে মনে হয়।

* বস্তু কখন জলে ভাসে ?

বস্তুর ওজন যদি অপসারিত জল অপেক্ষা বেশী হয় তাহলে ডুবে যাবে। যদি সমান সমান হয় তাহলে বস্তুটি জলে নিমজ্জিত হয়ে স্থির হয়ে ভাসবে। আর যদি বস্তুটির ওজন অপসারিত জল অপেক্ষা কম হয় তাহলে বস্তুটি জলের উপর ভাসতে থাকবে।

* বরফ জলে ভাসে কেন ?

এক সি. সি. জলের ওজন এক গ্রাম, কিন্তু এক সি. সি. জল জমে বরফ হলে তার ওজন হয় ০˙৯২ গ্রাম। অতএব বরফের যে কোন টুকরা সম আয়তন জল অপেক্ষা হালকা। তাই বরফ জলে ভাসতে থাকে। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ০°C তাপমাত্রার ১১ সি. সি. জল জমে ১২ সি.সি. বরফ উৎপন্ন করে। সেইজন্য বরফের চাঁই যখন জলে ভাসে তখন তার $\frac{১১}{১২}$ অংশ জলের তলায় থাকে এবং $\frac{১}{১২}$ অংশ মাত্র জলের উপরে থাকে।

* এক টুকরা লোহা জলে ডুবে যায় কিন্তু লোহার কড়াই জলে ভাসে কেন ?

লোহার টুকরাকে জলে ফেললে টুকরাটি যে পরিমাণ জল অপসারণ করে তার তুলনায় টুকরাটির ওজন অনেক বেশী। কিন্তু কড়াই লোহার তৈরী হলেও তার দ্বারা অপসারিত জলের ওজন অনেক বেশী। উক্ত কারণে লোহার টুকরা জলে ডুবে যায় এবং কড়াই ভাসতে থাকে। একই কথা লোহার তৈরী জাহাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

* সমুদ্র অপেক্ষা মিঠাজলের নদীতে জাহাজের বেশী অংশ নিমজ্জিত হয় কেন ?

সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি লবণ সমুদ্রজলে দ্রবীভূত থাকে বলে সমুদ্রজলের ঘনত্ব বেশী। উক্ত কারণে সমুদ্রজলের প্লবতাও বেশী। নদীর জলের ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলে প্লবতাও কম। তাই সমুদ্র অপেক্ষা নদীতে জাহাজের বেশী অংশ নিমজ্জিত হয়।

* মানুষ জলে সাঁতার কাটে কি ভাবে ?

মানুষের দেহটা সম আয়তন জলের চেয়ে হালকা কিন্তু মাথাটা অনেক ভারী। তাই জলে পড়লে শরীরটা ভেসে থাকতে চাইলেও মাথা ডুবে যেতে চায়। অতএব মাথাকে জলের বাহিরে রেখে হাত-পা নেড়ে জলে চাপ দিয়ে এবং জলকে অপসারণ করে এগিয়ে যাওয়ার নামই সাঁতারকাটা। ইতর জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে এমনটি নয় বলে সাঁতার তাদের স্বভাবজাত। কিন্তু মানুষকে সাঁতার শিখতে হয়।

* জাহাজের গায়ে সাদা রঙের কয়েকটি মোটা মোটা দাগ কাটা থাকে কেন ?

জাহাজের গায়ে সাদা দাগগুলিকে বলা হয় "প্লিম্সল" রেখা। ঐ রেখা জাহাজে কতখানি মাল বোঝাই পড়বে বা পড়েছে তারই নির্দেশক। অতিরিক্ত মাল বোঝাই করলে ঝড়-বাদলে জাহাজ ডুবে যেতে পারে। তাই সর্বনিম্ন কত মাল বোঝাই করতে হবে এবং কত পরিমাণ বোঝাই চলতে পারে—তা ঐ দাগগুলির জলে ডোবা থেকে নির্ণয় করা হয়।

* ডুবো জাহাজ জলের ভেতর দিয়ে কেমন করে এগিয়ে যায় এবং জলের উপরে ভেসে উঠে কেমন করে ?

ডুবো জাহাজের কতকগুলি প্রকোষ্ঠ থাকে। জলে ডোবার প্রয়োজন হলে ঐ প্রকোষ্ঠগুলিকে জলে বোঝাই করা হয়। তখন একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় স্থির হয়ে ভাসতে থাকে। এই অবস্থায় যন্ত্রের সাহায্যে এগিয়ে যায়। কিন্তু যখন জলের ভেতর থেকে উপরে উঠতে হয় তখন পাম্প দিয়ে প্রকোষ্ঠগুলির জলকে নিষ্কাশন করতে হয়। তখন

জাহাজ হালকা হয়ে পড়ে এবং জাহাজ অপেক্ষা অপসারিত জলের ওজন অনেক বেশী হওয়ায় আপনা হতে উপরে ভেসে উঠে।

* আপেক্ষিক গুরুত্ব কি ?

কোন বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব সেই বস্তুর যে কোন আয়তনের ওজন এবং সম আয়তনে জলের ওজনের অনুপাত। অন্যকথায় কোন বস্তুখণ্ড সম আয়তন জলের তুলনায় যতগুণ ভারী— তাকেই বলা হয় আপেক্ষিক গুরুত্ব। যেহেতু আপেক্ষিক গুরুত্ব তুলনামূলক একটি সংখ্যা, তাই তার একক নেই।

* ঘনত্ব কাকে বলে ?

ভারী বা হালকা বোঝাবার জন্য ঘনত্ব কথাটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে ঘনত্বের আসল সংজ্ঞা হল, কোন বস্তুর এক ঘন আয়তনে যতখানি ভর থাকে তাকেই বলা হয় বস্তুটির ঘনত্ব।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ঘনত্ব মাপার বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে যে কোন বস্তুর ভরকে তার আয়তন দিয়ে ভাগ করলে ঘনত্ব পাওয়া যায়। তাই ঘনত্বের সূত্র $= \frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}}$ ।

* F. P. S পদ্ধতিতে 8°C সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জলের ঘনত্ব কত ?

৬২·৫ পাউণ্ড/ঘনফুট।

* বায়ুর যে ওজন আছে—তা কিভাবে পরীক্ষা করা যায় ?

একটি কাচের বাল্বকে বায়ুশূন্য অবস্থায় ওজন করার পর তাকে বায়ু ভর্তি করে ওজন করলে দেখা যাবে যে পরবর্তী ওজন বেড়ে গেছে।

* বেলুনের আকাশে ওঠার সর্ত কি ?

তরলে নিমজ্জিত পদার্থ ঊর্ধ্বমুখী ঘাত অনুভব করলে যেমন তরলের উপরে ভাসতে থাকে তেমনই স্থানচ্যুত বায়ু কর্তৃক ঊর্ধ্বমুখী ঘাত যদি বেশী হয় তাহলে বেলুন আকাশে উঠবে। বেলুনের মধ্যে যে গ্যাস রাখা হয় সেটিকে বায়ু অপেক্ষা হালকা হতে হয়। তবেই

বায়ু কর্তৃক ঊর্ধ্বমুখী ঘাত বেশী অনুভব করবে। তাছাড়া লক্ষ্য করতে হবে, বেলুন কর্তৃক অপসারিত বায়ুর ওজন বেলুনের ভেতরের গ্যাসের ওজন অপেক্ষা যেন বেশী হয়।

* বায়ুমণ্ডলের চাপ বলতে কি বোঝায়?

আমরা বায়ুসমুদ্রে ডুবে আছি। অর্থাৎ আমাদের চারদিকে কেবল বায়ু আর বায়ু। বায়ুর স্তরটা আবার পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬০০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে উপরের দিকে ক্রমশ পাতলা হয়ে গেছে। বায়ুর এই যে সুদীর্ঘ স্তর—যা পৃথিবীর উপর অহরহ চাপ প্রদান করছে তাকেই বলে বায়ুমণ্ডলের চাপ।

* পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বায়ুচাপের পরিমাণ কত?

প্রায় ১৪·৭ পাউণ্ড।

* একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর বায়ু কি পরিমাণ চাপ প্রদান করে?

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহের ক্ষেত্রফল প্রায় ১৬ বর্গফুট। তাই তার উপরে বায়ুর চাপের পরিমাণ ১৬×১৪৪×১৪·৭ পাউণ্ড বা ৩৩৮৬৮·৮ পাউণ্ড।

* পৃথিবীপৃষ্ঠে সাধারণ বায়ুচাপের পরিমাণ কত?

৭৬ সে. মি. পারদস্তম্ভের উচ্চতার সমান।

* বায়ুমণ্ডলের চাপ কত উচ্চ জলস্তম্ভকে ধরে রাখতে পারে?

যেহেতু জল অপেক্ষা পারদ ১৩·৬ গুণ ভারী, তাই ৭৬ × ১৩·৬ সে. মি. বা ১০৩৩·৬ সে. মি. বা ৩৪ ফুট উচ্চ জলস্তম্ভকে ধরে রাখতে পারবে। উক্ত কারণে সাধারণ পাম্পের সাহায্যে ৩৪ ফুটের উপরে জল তোলা সম্ভব হয় না।

* ব্যারোমিটার আবহাওয়ার পূর্বাভাস কিভাবে প্রদান করে?

যেহেতু জলীয় বাষ্প সাধারণ বায়ু অপেক্ষা হালকা, তাই বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়তে থাকলে বায়ুর চাপ কমে যায় এবং ব্যারোমিটারের পাঠ ধীরে ধীরে নামতে থাকে। অতএব ব্যারোমিটারের পাঠ নামলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে এবং

শীঘ্র বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝতে হবে।

* হঠাৎ যদি ব্যারোমিটারের পাঠ নেমে যায় তাহলে কি হবে?

ব্যারোমিটারের পাঠ হঠাৎ নেমে গেলে বুঝতে হবে সেখানে বায়ুর চাপ কমে গেছে। কিছু পরেই পার্শ্ববর্তী উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু প্রবল বেগে ছুটে এসে নিম্নচাপের অঞ্চলকে অধিকার করবে। ফলে প্রবল ঝড় অথবা ঘূর্ণিঝড় শুরু হবে।

* বায়ুশূন্য স্থানে এক পাউণ্ড তুলা এবং এক পাউণ্ড লোহার মধ্যে কোনটিকে বেশী ভারী মনে হবে?

এক পাউণ্ড তুলার আয়তন এক পাউণ্ড লোহা অপেক্ষা অনেক বেশী। তাই উভয়কে বায়ুতে ওজন করলে লোহা অপেক্ষা তুলা অনেক বেশী বায়ুকে অপসারণ করে এবং বেশী ঊর্দ্ধঘাতও অনুভব করে। কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে প্রকৃত ওজন পাওয়া যাবে বলে এক পাউণ্ড তুলার ওজন বেশী হবে।

* তরলের পৃষ্ঠটান কাকে বলে?

আধারে রক্ষিত যে কোন তরল পদার্থের পৃষ্ঠদেশে স্থিতিস্থাপক পর্দার টানের মত একটা টান অনুভব করে। ঐ টানকে তরলের পৃষ্ঠটান বলা হয়।

* তরলের পৃষ্ঠটান আছে—তা কিভাবে পরীক্ষা করা যায়?

একটি জলপূর্ণ গ্লাসের উপর এক টুকরা ব্লটিং পেপার জড়ানো তৈলাক্ত সূচকে ভাসিয়ে দিলে ব্লটিং পেপারটি জল শোষণ করে গ্লাসের তলায় থিতিয়ে পড়বে কিন্তু সূচটি লম্বালম্বিভাবে জলের উপরে ভাসতে থাকবে।

* স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?

বস্তুর যে ধর্মের জন্য বাহির থেকে প্রযুক্ত বলকে সরিয়ে নিলেও পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তাকে বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। যেমন, রবারকে টান দিলে দৈর্ঘ্যে বেড়ে যায় কিন্তু ছেড়ে দিলে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।

* সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু কারা ?

ইস্পাত প্রভৃতিকে আয়তনের বিকৃতি ঘটাতে অত্যধিক বল প্রয়োগ করতে হয়। তাই এরা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক।

* সম্পূর্ণ দৃঢ় বস্তু কাদের বলা হয় ?

টাংস্টেন প্রভৃতি ধাতুর উপর অত্যধিক বল প্রযুক্ত হলেও বিকৃতি ঘটে না। তাই তাদের বলা হয় সম্পুর্ণ দৃঢ় বস্তু। তবে এও সত্য যে, কোন বস্তুই সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় নয়। অধিক বলে অতি অল্প হলেও বিকৃতি ঘটে।

* লোহা ও রবারের মধ্যে কোন্‌টি বেশী স্থিতিস্থাপক ?

লোহা ও রবারের মধ্যে একই পরিমাণ বিকৃতি ঘটাতে হলে লোহাতে অনেক বেশী বল প্রয়োগ করতে হয়। তাই লোহা বেশী স্থিতিস্থাপক।

* জেট ইঞ্জিন ও রকেট কোন্ কোন্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ? এদের মধ্যে মূল প্রভেদ কী ?

উভয়েই কাজ করে রৈখিক ভরবেগ সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী। উভয়ক্ষেত্রে জ্বালানীর সঙ্গে কোন জারক পদার্থ মিশিয়ে দহন করানো হয়। ফলে প্রচুর তাপ যেমন উৎপন্ন হয় তেমনই প্রচুর গ্যাসেরও সৃষ্টি হয়। সেই গ্যাস প্রবলভাবে চাপ দেয় এবং একমাত্র নির্গমন নল পথে সবেগে বেরিয়ে আসে। এতে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী যে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বলের সৃষ্টি হয় তাতে উভয়েই ধাবিত হয় সম্মুখপানে।

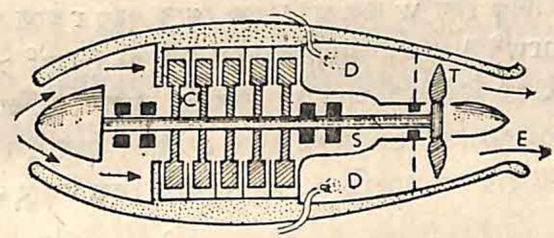
জেট ইঞ্জিন বায়ু থেকে প্রয়োজনীয় জারক দ্রব্য তথা অক্সিজেন সংগ্রহ করে কিন্তু রকেটকে প্রয়োজনীয় জারক দ্রব্য বহন করতে হয়। উক্ত কারণে বায়ুমণ্ডলের বাহিরে জেট ইঞ্জিন কাজ করতে পারে না। কিন্তু রকেটে জারক দ্রব্য বহন করার জন্য বায়ুমণ্ডলের বাহিরেও কর্মক্ষম থাকে।

* জেট ইঞ্জিনের গঠন এবং কার্যপ্রণালী কেমন ?

জেট ইঞ্জিনের মাঝখানে একটি অক্ষদণ্ডের (S) চারপাশে কতকগুলো সংনমক পাখা বা ব্লেড সাজানো থাকে। সম্মুখভাগে বলয়াকৃতি খোলা জায়গা এবং ঐ পথে বায়ু প্রবেশ করতে পারে। পশ্চাতে

যুক্ত থাকে একটা টারবাইন (T)। ইঞ্জিনের যে অংশে সংনমক পাখাগুলো সাজানো থাকে সেই অংশকে বলে সংনমক বা কম্প্রেসার (C)। পরবর্তী অংশটিকে বলা হয় দহনকক্ষ (D)। বায়ু প্রথমত সংনমন কক্ষে প্রবেশ করলে জ্বালানীর সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং সংনমিত হয়। অতঃপর অধিক চাপে দহনকক্ষে প্রবেশ করে। এই দহনকক্ষেই উভয় মিশ্রনের দহন হয়। আর দহনের ফলে উদ্ভূত হয় প্রচুর গ্যাস। ঐ গ্যাস তখন টারবাইনকে ঘোরাতে থাকে এবং নির্গমন পথ (E) দিয়ে প্রবলবেগে নির্গত হতে থাকে। তার ফলেই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় জেটযুক্ত বিমান প্রবল গতিবেগ প্রাপ্ত হয়।

জেট সাধারণত দু'ধরনের। টার্বোজেট ও রামজেট। রামজেট অতি উচ্চ গতিসম্পন্ন বিমানে ব্যবহৃত হয়। এতে সংনমক থাকে না এবং থাকে না টারবাইন। জ্বালানীসহ বায়ুকে উচ্চচাপে দহনকক্ষে প্রবেশ করানো হয় তারপর দহন ঘটে। উভয় জেটের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে ইঞ্জিন কার্যকর হয় না। যাত্রা শুরু করার পরেই জেট ইঞ্জিন কাজ করে এবং বিমান ও উচ্চ গতিবেগসম্পন্ন হয়।



* অভিকেন্দ্র বল (centripetal force) ও অপকেন্দ্র বল (centrifugal force) কাকে বলে?

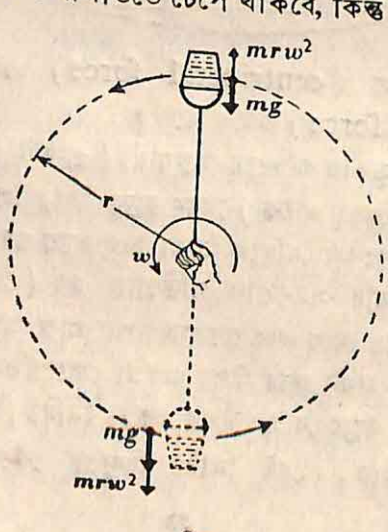
নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী (প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে) কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে তার ত্বরণ হয় এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ত্বরণও হয় সেই একই দিকে। বস্তুটি যদি সমবৃত্তীয় গতিপ্রাপ্ত হয় (যেমন, একটি ইটের টুকরোকে সুতোয় বেঁধে এবং সুতোর অপর প্রান্ত আঙ্গুলে জড়িয়ে যদি ঘোরানো যায়) তখন তার উপর একটা কেন্দ্রাভিমুখী বল ক্রিয়াশীল হয় এবং ঐ বল বস্তুর বেগের উপর একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখে লম্বভাবে ক্রিয়া করে। সেই নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে বস্তুর যে

সমবৃত্তীয় গতির সৃষ্টি হয় তাকেই বলে অভিকেন্দ্র বল।

আবার ক্রিয়ার যেহেতু সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, তাই ঘূর্ণনশীল বা সমবৃত্তীয় গতিসম্পন্ন বস্তুর উপর যে অভিকেন্দ্র বল ক্রিয়া করে তার সমান ও বিপরীতমুখী আর এক বলও ক্রিয়া করে। ওকেই বলে অপকেন্দ্র বল। যেহেতু এটি একটি প্রতিক্রিয়া তাই অপকেন্দ্র প্রতিক্রিয়াও বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ইটের টুকরোকে সুতোয় বেঁধে ঘোরাতে থাকলে সুতোর টান হাতের উপর প্রযুক্ত হয় এবং ঐ বল সুতোর দৈর্ঘ্য বরাবর ঢিলের দিকে ক্রিয়াশীল হয়।

* জলপূর্ণ একটা বালতির হাতলে দড়ি বেঁধে ঘোরাতে থাকলে সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে বালতি সম্পূর্ণরূপে উল্টানো অবস্থায় এলেও বালতির জল পড়ে না কেন?

এটি অভিকেন্দ্র বলের ও অপকেন্দ্র বলের ক্রিয়া প্রদর্শনের একটি পরীক্ষা। বালতিকে খুব দ্রুত উলম্ব-তলে ঘোরাতে থাকলে সর্বোচ্চ বিন্দুতে জলের ওজন এবং বালতির প্রতিক্রিয়া সম্মিলিতভাবে অভিকেন্দ্র বল সরবরাহ করতে থাকে। যদি অভিকেন্দ্র বল (জলের ভর m, সমকৌণিক বেগ w এবং ঘূর্ণনকেন্দ্র থেকে দূরত্ব r হলে অভিকেন্দ্র বল হয় mrw^2) জলেন ওজন অপেক্ষা বেশী হয় ($rw^2 > g$ হয়) তাহলে উর্ধ্বে উল্টানো অবস্থায় একসময় এলেও অভিকেন্দ্র বল জলের উপর বালতির তলদেশের প্রতিক্রিয়ারূপে ক্রিয়াশীল থাকবে। অনুরূপ অবস্থায় জল বালতিতে চেপে থাকবে, কিন্তু পড়বে না।



প্রশ্ন ঃ তাপ

* তাপ কি ?

তাপ একরকম শক্তি। কোন বস্তুর উক্ত শক্তিকে গ্রহণ করলে তার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং বর্জন করলে উষ্ণতার হ্রাস পায়। অপর-দিকে বস্তু মাত্রই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সমন্বয়ে গঠিত। সেই অণুগুলি আবার স্থির অবস্থায় অবস্থান করছে না। তাদের গতিশক্তির মধ্যেই তাপের উৎস বিদ্যমান। কোন এক বিশেষ তাপমাত্রায় অণুগুলির যে গতিশক্তি থাকে বাহির থেকে প্রযুক্ত তাপে তাদের সেই গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। তখনই বস্তুটি উত্তপ্ত হতে আরম্ভ করে।

* তাপ ও তাপমাত্রা বা উষ্ণতা কি একই কথা ?

না। তাপ একটি শক্তি এবং এই শক্তিকে গ্রহণ করলে বস্তু উত্তপ্ত হয় আর বর্জন করলে শীতল হয়। অপরপক্ষে তাপমাত্রা বলতে বস্তুর উষ্ণতার মাত্রাকে নির্দেশ করে। তাছাড়া তাপমাত্রা বস্তুর এমন এক তাপীয় অবস্থা—যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, ঐ বস্তুটি অন্য বস্তুকে তাপ প্রদান করবে অথবা সেখান থেকে তাপকে গ্রহণ করবে। তাই তাপকে যদি কারণ ধরা হয় তাহলে তাপমাত্রা হবে তার ফল।

* গরম জলে কিছুক্ষণ হাত ডুবিয়ে রাখার পর ঠাণ্ডা জলে পুনরায় হাত ডোবালে বেশী ঠাণ্ডা মনে হয় কেন ?

আসলে স্পর্শের মাধ্যমে আমরা উষ্ণতার অনুভব সঠিকভাবে করতে পারি না। কোন বস্তু থেকে আমাদের শরীরে যে হারে তাপ সঞ্চালিত হয় তার উপরেই উষ্ণতার অনুভূতি নির্ভর করে এবং যেহেতু অনুভূতির ব্যাপার, তাই সব সময় সূক্ষ্মও হতে পারে না। উষ্ণ জলে হাত ডুবিয়ে রাখার পর হাতকে তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জলে ডোবালে আপাত-অনুভূতিটাই কাজ করবে, তাই একটু বেশী ঠাণ্ডা বলেই মনে হবে। অপরপক্ষে ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবিয়ে রাখার পর অপেক্ষাকৃত গরম জলে আবার যদি হাত ডোবান যায় তাহলে ঐ আপাত-অনুভূতির জন্যই বেশী গরম মনে হবে। প্রমাণস্বরূপ দুটি হাতের চেটোর একটিকে

গরম জলে এবং অপরটিকে ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ রাখার পর একই সঙ্গে দুটিকে ঈষদুষ্ণ জলে ডোবালে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা হাতটিকে গরম মনে হবে এবং গরম জলে ডুবিয়ে রাখা হাতটিকে ঠাণ্ডা মনে হবে।

* টিউবওয়েলের জল শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা মনে হয় কেন ?

মাটি তাপের কুপরিবাহী। টিউবওয়েলের জল মাটির বেশ কিছু গভীর থেকেই উত্তোলন করা হয়। এবং সেখানকার জল একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় থাকে। শীতকালে বাহিরের আবহাওয়া যখন ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে তখন সেই ঠাণ্ডাটি তাপের কুপরিবাহী মাটিকে ভেদ করে তলার জলকে ঠাণ্ডা করতে পারে না। অপরপক্ষে গ্রীষ্মকালে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বেড়ে গেলেও সে উষ্ণতা নিচে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। উক্ত কারণে শীতে অথবা গরমে মাটির তলায় জলের তাপমাত্রার পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। স্পর্শানুভূতিও কাজ করে এখানে। বাহিরের ঠাণ্ডার ফলে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জল বেশী উষ্ণ মনে হয় এবং গরমে অভ্যস্ত শরীর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জলকে একটু বেশী ঠাণ্ডা বলে মনে করে।

* শীতপ্রধান দেশের লোক গ্রাষ্মপ্রধান দেশে অস্বস্তি অনুভব করে কেন ?

এ ক্ষেত্রেও স্পর্শানুভূতি কাজ করে থাকে। শীতে অভ্যস্ত বলে গরমের অনুভূতি বেশী। অন্যদিকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ শীতপ্রধান দেশে অধিক শীত মনে করবে।

* তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার কাকে বলে ?

যে যন্ত্রের দ্বারা কোন বস্তুর তাপমাত্রা বা উষ্ণতা সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় তাকেই বলে তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার।

* উষ্ণতামাপক পদার্থ বলতে কি বোঝায় ?

উষ্ণতাকে সরাসরি মাপা যায় না। এমন কিছু কিছু পদার্থ আছে, উষ্ণতা বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের ফলে তাদের কোন কোন ভৌতধর্মের নিয়মিত পরিবর্তন হতে দেখা যায়। উক্ত কারণে বিভিন্ন ধরণের

তাপমান যন্ত্রে ওদের ব্যবহার করে উষ্ণতার পরিমাপ করা হয়। তাপমান যন্ত্রে ব্যবহারের যোগ্য সেইসব পদার্থকেই বলা হয় উষ্ণতা-মাপক পদার্থ।

* কোন্ কোন্ উষ্ণতামাপক পদার্থ কোন্ কোন্ ভৌতধর্মের জন্য তাপমান যন্ত্রে ব্যবহার করা হয় ?

১। পারদ, অ্যালকোহল প্রভৃতি তরলের আয়তন উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। উক্ত কারণে ঐসব তরল দিয়ে নির্মিত থার্মোমিটারকে বলা হয় তরল থার্মোমিটার।

২। গ্যাসের চাপ ঠিক থাকলে তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটলে তার আয়তনেরও নিয়মিত পরিবর্তন হতে দেখা যায়। গ্যাসের উক্ত ধর্মকে কাজে লাগিয়ে তৈরী করা হয় স্থির চাপ গ্যাস থার্মোমিটার।

৩। তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কোন কোন তড়িৎ পরিবাহীর রোধ বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রা হ্রাস পেলে রোধও হ্রাস পায়। প্লাটিনাম নামক ধাতুটির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই ধর্মটি খুবই নিয়মানুগ। তাই প্লাটিনামের এই ধর্মটিকে কাজে লাগিয়ে তৈরী করা হয় প্লাটিনাম রেজিস্টেশন্স থার্মোমিটার। অধিক তাপমাত্রা নির্ণয়ের কাজে ওকে ব্যবহার করা হয়।

৪। ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর দুটি তারকে সংযুক্ত করে, সংযোগস্থলে দুই ধাতুতে ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। সংযুক্ত ঐ ধাতব তারদ্বয়কে বলা হয় থার্মোকাপল। দেখা গেছে, তামা ও কনস্টাণ্টান নামক ধাতুর তৈরী থার্মোকাপলের ক্ষেত্রে ঐ ধর্মটি বেশ নিয়মানুগ। তাই উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমেও তাপমাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে যেখানে তাপমাত্রা অত্যধিক সেখানেই থার্মোকাপলের প্রয়োজন হয় বেশী।

* দৈনন্দিন কাজকর্মে সবচেয়ে বেশী কোন্ থার্মোমিটারকে ব্যবহার করা হয় ?

পারদ দ্বারা নির্মিত থার্মোমিটার।

* পারদ থার্মোমিটারের দ্বারা তাপমাত্রা পরিমাপের পাল্লা কত ?

যেহেতু পারদ—৩৯° সেন্টিগ্রেডে জমে যায় এবং ৩৫০° সেন্টিগ্রেডে বাষ্পীভূত হয়, তাই পারদ থার্মোমিটারের দ্বারা—৩৯° থেকে ৩৫০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রার পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

* থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারে সুবিধাগুলি কি কি ?

তাপমাত্রার পরিবর্তনে পারদের আয়তন পরিবর্তন খুবই নিয়মানুগ। অন্যান্য অনেক তরল অপেক্ষা তাপবৃদ্ধিতে পারদের আয়তন অতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পারদ বেশ চকচকে, কাচের দেওয়াল ভেজায় না, বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং বস্তু থেকে অতি অল্প তাপ শোষণ করে।

* অ্যালকোহল থার্মোমিটার ব্যবহারের সুবিধা কোথায় ?

অ্যালকোহল—১৩০° সেন্টিগ্রেডে জমে যায় কিন্তু মাত্র ৭৮° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বাষ্পীভূত হতে আরম্ভ করে। তাই নিম্ন তাপমাত্রা পরিমাপের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল থার্মোমিটার ছাড়া উপায় থাকে না।

অ্যালকোহলের তাপগ্রাহিতা বেশী ও আপেক্ষিক গুরুত্ব কম। কিন্তু পারদের তাপগ্রাহিতা কম অথচ আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক বেশী। তাই যে বস্তুর উষ্ণতা নির্ণয় করতে হয় সেখান থেকে পারদ অপেক্ষা অ্যালকোহল অনেক কম তাপ গ্রহণ করে।

তাছাড়া পারদের প্রসারণ গুণাঙ্ক (০·০০০১৮) অপেক্ষা অ্যালকোহলের প্রসারণ গুণাঙ্ক (০·০০১০৪) বেশী হওয়ায় অল্প তাপমাত্রা বৃদ্ধিতেও অ্যালকোহলের প্রসার হয় বেশ বেশী।

তাই নীতির দিক থেকে অ্যালকোহল অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাজনক। কিন্তু অ্যালকোহল স্বচ্ছ বলে কাচের ভেতর থেকে দেখার অসুবিধা। উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য অ্যালকোহলের সঙ্গে একটু রঙ মিশিয়ে রঙীন করা হয়।

* দিন রাত্রির তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি কোন্ থার্মোমিটারের সাহায্যে নির্ণয় করা হয় ?

"চরম ও অবম" থার্মোমিটারের দ্বারা।

* থার্মোমিটারের স্কেলের স্থিরাঙ্ক কাকে বলে ?

থার্মোমিটারের স্কেল ঠিক করার জন্য দুটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পারদ কোথায় কোথায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়—তা নির্ণয় করা হয়। ঐ নির্দিষ্ট তাপমাত্রাদ্বয়কে বলা হয় স্থিরাঙ্ক।

* নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা হিমাঙ্ক ও উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক কাকে বলে ?

বায়ুমণ্ডলের প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় বিশুদ্ধ বরফ গলতে শুরু করে সেই উষ্ণতাকে বলা হয় নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা হিমাঙ্ক এবং যে উষ্ণতায় ফুটন্ত জল থেকে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হতে থাকে তাকে বলা হয় উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক।

* থার্মোমিটারের বিভিন্ন স্কেল কিভাবে তৈরী হয় ?

দুই স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী উষ্ণতার ব্যবধানকে বা প্রাথমিক অন্তরকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে উষ্ণতার স্কেল তৈরী করা হয়।

* উষ্ণতা পরিমাপের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত স্কেল দুটি কি কি ?

সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস স্কেল এবং ফারেনহাইট স্কেল। সেন্টিগ্রেড স্কেলে হিমাঙ্ককে ০° এবং স্ফুটনাঙ্ককে ১০০° ধরা হয়। কিন্তু ফারেনহাইট স্কেলে হিমাঙ্ককে ৩২° এবং স্ফুটনাঙ্ককে ২১২° ধরা হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রাথমিক অন্তর ১০০—০ বা ১০০ এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে প্রাথমিক অন্তর ২১২—৩২ বা ১৮০।

* সেন্টিগ্রেড স্কেলের এক ডিগ্রী ফারেনহাইট স্কেলের কত ডিগ্রীর সমান ?

যেহেতু সেন্টিগ্রেড স্কেলের এবং ফারেনহাইট স্কেলের অন্তর যথাক্রমে ১০০ এবং ১৮০, তাই ১° সেন্টিগ্রেড $= \frac{১৮০}{১০০}$ বা $\frac{৯}{৫}$ ডিগ্রী ফারেনহাইটের সমান।

* একই জায়গায় যদি দুটি থার্মোমিটার থাকে এবং দুটি থার্মোমিটার যদি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ নির্দেশ করে তাহলে কি বুঝতে হবে ?

দুটি থার্মোমিটারে দুটি স্কেলে দাগ কাটা আছে।

* মানবদেহের তাপমাত্রা পরীক্ষার জন্য যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় তার নাম এবং বৈশিষ্ট্য কি ?

* ডাক্তারী থার্মোমিটার বা ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার। এর বৈশিষ্ট্য, তলায় যে পারদ রাখার কুণ্ডটি আছে তার একটু উপরে পারদ ওঠানামার রন্ধ্রপথটি একটু সঙ্কুচিত ও বাঁকানো অবস্থায় থাকে। ফলে পারদ প্রসারিত হয়ে রন্ধ্রপথ বেয়ে উপরে উঠে যেতে পারে কিন্তু বাইরের কম তাপমাত্রায় পারদ সঙ্কুচিত হয়ে নেমে আসতে পারে না।

* ডাক্তারী থার্মোমিটারে ৯৫° থেকে ১১০° দাগ কাটা কেন ?

ডাক্তারী থার্মোমিটারের দাগ ফারেনহাইট স্কেলে কাটা থাকে এবং মানবদেহের তাপমাত্রা ঐ ব্যবধানের মধ্যে ওঠানামা করে।

* ডাক্তারী থার্মোমিটারে ৯৮·৪° এর উপর একটি লাল দাগ থাকে কেন ?

মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮·৪°। জিভের তলায় থার্মোমিটার রাখলে ঐ তাপমাত্রাই পাওয়া যায়।

* মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা সেন্টিগ্রেড স্কেলে কত হবে ?

মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেড স্কেলে C ধরলে এবং দুটি স্কেলকে তুলনা করলে $\frac{C}{১০০} = \frac{৯৮·৪ - ৩২}{১৮০}$ বা $\frac{C}{৫} = \frac{৬৬·৪}{৯}$

বা ৯C = ৫ × ৬৬·৪ বা $C = \frac{৫ \times ৬৬·৪}{৯}$ বা ৩৭° (প্রায়)।

* বেকম্যান থার্মোমিটার কেমন ?

উক্ত থার্মোমিটারের দ্বারা উষ্ণতার অতি সামান্যতম পরিবর্তনও ধরা যায়। এতে মাত্র ৬ কিংবা ৭ ডিগ্রী পরিমিত স্কেল থাকে এবং প্রতিটি ডিগ্রীকে ১০০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মূল পারদ নলের নিম্নস্থ কুণ্ডটির পারদ প্রয়োজনানুযায়ী উপরের দিকে নলের সঙ্গে সংলগ্ন আর একটি কাচের গোলকে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা থাকে।

* কোন্ তাপমাত্রা সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট স্কেলে সমান ?

—৪০°। [X ধরে এ ক্ষেত্রে সমাধান করা যায়। $\frac{X}{৫}=\frac{X-৩২}{৯}$ বা ৯X = ৫X—১৬০ বা ৪X = —১৬০ বা X = —৪০]

* ডাক্তারী থার্মোমিটার "½ minute" লেখা থাকে কেন ?

থার্মোমিটারকে জিভের তলায় ½ মিনিটকাল রাখলে শরীরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নির্দেশ করে।

* ডাক্তারী থার্মোমিটারকে গরম জলে ডোবাতে নেই কেন ?

ডাক্তারী থার্মোমিটারে মাত্র ১১০° ফারেনহাইট পর্যন্ত পারদ প্রসারণের সুবিধা আছে। সেন্টিগ্রেড স্কেলে ঐ তাপ মাত্র ৪৪°-রও কম। কিন্তু গরম জলের তাপমাত্রা যদি ৪৪° বা তার বেশী হয় তাহলে পারদ বেশী প্রসারিত হবে বলে থার্মোমিটার ফেটে যাবে।

* পরিমাপযোগ্য সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত ?

—২৭৩° সেন্টিগ্রেডই পরিমাপযোগ্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এর নিম্ন তাপমাত্রা আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু সর্বোচ্চ তাপমাত্রার এমন কোন সীমারেখা নেই। স্বল্প পরিসরে এবং অতি স্বল্পকালের জন্য ২০০০°C থেকে ২০০০০°C তাপমাত্রা সৃষ্টি মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

* আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে ?

বিভিন্ন বস্তু কর্তৃক তাপ গ্রহণ কিংবা বর্জন এমনকি বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি কেবল ওর ভর বা তাপ প্রদানের উপর নির্ভর করে না। বস্তুর একটি বিশেষ ধর্মের উপরই নির্ভর করে থাকে। বস্তুর ঐ ধর্মটিকে বলা হয় আপেক্ষিক তাপ। সাধারণত একক ভরের কোন বস্তুর এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপই আপেক্ষিক তাপ।

* তাপগ্রাহিতা কি ?

কোন বস্তুর এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে যে

তাপের প্রয়োজন হয় তাকেই বলে বস্তুটির তাপগ্রাহিতা। সাধারণত বস্তুর তাপগ্রাহিতা = বস্তুর ভর × তার আপেক্ষিক তাপ। যে বস্তুর তাপগ্রাহিতা যত বেশী সে বস্তু তত তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়।

* সমান ভরের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে সমানভাবে তাপ প্রয়োগ করলে সবার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা কি সমান হবে ?

না। যেহেতু সবার ভর সমান হলেও তাপগ্রাহিতা সমান নয়। তাই সবাই সমানভাবে উষ্ণ হতে পারে না।

* একই ধরণের দুটি কেটলির একটিতে জল এবং অপরটিতে সমপরিমাণ দুধ রেখে একই উনানে পাশাপাশি গরম করলে জল অপেক্ষা দুধের তাপমাত্রা বেশী বৃদ্ধি পায় কেন ?

জল অপেক্ষা দুধের তাপগ্রাহিতা বেশী বলে দুধের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

* জ্বালানীর তাপনমূল্য কাকে বলে ?

এক গ্রাম কঠিন কিংবা তরল জ্বালানী অথবা এক ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসীয় জ্বালানী দহন করলে যে পরিমাণ তাপ পাওয়া যায় তাকেই তার তাপনমূল্য বলা হয়।

* কোন্ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ সবচেয়ে বেশী ?

জলের আপেক্ষিক তাপই সবচেয়ে বেশী। এবং জলের আপেক্ষিক তাপকে ১ ধরা হয়। দেখা গেছে, ১° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য জল যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ কিংবা বর্জন করে সমভরের অন্য যে কোন কঠিন কিংবা তরল তদপেক্ষা অনেক কম তাপ গ্রহণ কিংবা বর্জন করে থাকে।

* জলের আপেক্ষিক তাপ বেশী হওয়ায় আমাদের কোন্ কোন্ কাজে সুবিধা হয়েছে এবং কেন ?

আপেক্ষিক তাপ বেশী হওয়ায় জল অপরাপর পদার্থ অপেক্ষা অনেক বেশী তাপ গ্রহণ করতে পারে এবং বর্জনও করতে পারে অনেক তাপ। তাই ইঞ্জিন ইত্যাদিকে শীতল করতে গেলে অন্যান্য যে কোন

তরল অপেক্ষা জলের সুবিধাই বেশী। অপরদিকে কোন কিছুকে উষ্ণ করতে হলে গরম জলের বোতল কিংবা ব্যাগ ইত্যাদিকে ব্যবহার করলে যথেষ্ট সুবিধা পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশসমূহে তাই ঘরবাড়ীকে গরম করতে গরম জলের প্রবাহ পাঠানো হয়।

* জলের আপেক্ষিক তাপ বেশী হওয়ায় সমুদ্রতীরের আবহাওয়াকে কতখানি প্রভাবিত করেছে?

দিবাভাগে সূর্যের উত্তাপে স্থলভাগ যতখানি গরম হয়ে উঠে, সমুদ্র-পৃষ্ঠ ততখানি গরম হতে পারে না। কারণ মাটি অপেক্ষা জলের আপেক্ষিক তাপ বেশী। আবার রাত্রিতে স্থলভাগ যত দ্রুত তাপ হারাতে পারে জলভাগ তত দ্রুত পারে না। তাই স্থলবায়ু ও সমুদ্র-বায়ুর উদ্ভব হয়।

অপরদিকে সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে প্রচুর তাপশক্তি বিদ্যমান বলে মনে করা যেতে পারে। তাই সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল ওর দ্বারা প্রভাবিত অবশ্যই হয়ে থাকে।

* লীনতাপ কাকে বলে?

একখণ্ড ০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার বরফে তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে এবং সঙ্গে সঙ্গে থার্মোমিটারের সাহায্যে পাঠ গ্রহণ করতে থাকলে দেখা যাবে, তাপ গ্রহণের ফলে বরফ গলতে থাকলেও থার্মোমিটারের পাঠ সেই ০° সেন্টিগ্রেডই আছে। যখনই বরফের গলন সম্পূর্ণ হবে তখনই থার্মোমিটারের পাঠ ধীরে ধীরে উঠতে থাকবে।

অপরপক্ষে ঐ বরফ গলা জলকে যতই গরম করা হবে ততই থার্মোমিটারে পাঠ বাড়তে থাকবে। একসময় যখন ১০০° সেন্টিগ্রেড পাঠ নির্দেশ করবে তখনই জল ফুটে বাষ্প হতে আরম্ভ করবে। কিন্তু তাপ প্রয়োগ সমানভাবে চলতে থাকলেও থার্মোমিটারের পাঠ ১০০° সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে উপরে উঠবে না। অথচ জল বাষ্পীভূত হতেই থাকবে।

জলকে ঠাণ্ডা করলেও অনুরূপ ঘটনা লক্ষ্য করা যাবে। তাপমাত্রা

নামতে নামতে ০° সেন্টিগ্রেডে এলেই জল বরফ হতে শুরু করবে এবং সম্পূর্ণরূপে বরফ না হওয়া পর্যন্ত তাপ হ্রাস সত্ত্বেও তাপমাত্রার হ্রাস পাবে না। সম্পূর্ণরূপে বরফে পরিণত হওয়ার পরেই হ্রাস পেতে থাকবে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, যখন পদার্থের অবস্থান্তর ঘটে তখন পদার্থটি কিছু তাপ গ্রহণ অথবা বর্জন করে। কিন্তু ঐ গ্রহণ কিংবা বর্জনের বাহ্যিক প্রকাশ পায় না। ঐ তাপকেই বলা হয় লীনতাপ অথবা গুপ্ত তাপ।

* বরফ গলনের এবং জলের বাষ্পীভবনের লীনতাপ কত ?

বরফ গলনের লীনতাপ ৮০ ক্যালরি। অর্থাৎ ০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার ১ গ্রাম বরফকে ০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার ১ গ্রাম জলে পরিণত করতে হলে ৮০ ক্যালরি তাপ প্রদান করতে হয়।

অনুরূপভাবে ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার ১ গ্রাম জলকে ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার ১ গ্রাম স্টীম বা জলীয় বাষ্পে পরিণত করতে ৫৪০ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন। তাই জলের বাষ্পীভবনের লীনতাপ ৫৪০ ক্যালরি। কোথাও কোথাও বাষ্পীভবনের লীনতাপ ৫৩৭ ক্যালরিও ধরা হয়।

* শীতপ্রধান দেশসমূহে ঘরবাড়ী গরম করার কাজে গরম জল অপেক্ষা স্টীমকে বেশী ব্যবহার করা হয় কেন ?

স্টীমের লীনতাপ যেহেতু ৫৪০ ক্যালরি, তাই ১০০° সেন্টিগ্রেডের ১ গ্রাম স্টীম ১০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার এক গ্রাম জলে যখনই পরিণত হয় তখনই বর্জন করে ৫৪০ ক্যালরি তাপ। তাই গরম জল অপেক্ষা স্টীমের অন্তর্নিহিত তাপ অনেক বেশী। উক্ত কারণে গরম জল অপেক্ষা স্টীমের ব্যবহারই অধিক সুবিধাজনক।

* তাপীয় প্রসারণ কাকে বলে ?

তাপ প্রয়োগের ফলে যে কোন পদার্থের আয়তন কিছু না কিছু বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে, গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রসারণ সবচেয়ে বেশী,

তরলের ক্ষেত্রেও বেশ কিছুটা উল্লেখযোগ্য কিন্তু কঠিনের ক্ষেত্রে নিতান্ত সামান্যই। তাপ প্রয়োগে পদার্থের যে আয়তন বৃদ্ধি ঘটে তাকেই বলা হয় তাপীয় প্রসারণ।

* তাপ প্রয়োগে সব কঠিন পদার্থ কি সমভাবে প্রসারিত হয় ?

না। ধাতুর ক্ষেত্রে প্রসারণ বেশী হয়ে থাকে। আবার ইনভার নামক লোহা ও নিকেলের একটি সঙ্কর আদৌ প্রসারিত হয় না বললেও চলে।

* তাপ প্রয়োগে পদার্থ কেন প্রসারিত হয় ?

পদার্থ মাত্রই অসংখ্য পরমাণু সমবায়ে গঠিত। পরমাণুগুলির মধ্যে একরকম স্থিতিস্থাপক বল কাজ করে থাকে এবং ঐ বলের জন্য পরমাণুগুলির একটা নিয়মিত বিন্যাস থাকে। আর থাকে প্রত্যেকের মধ্যে একটা গড় দূরত্ব। কিন্তু যখনই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তখন পদার্থের পরমাণুগুলির মধ্যে স্থিতিস্থাপক বল কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় পরমাণুগুলি এত স্পন্দিত হতে আরম্ভ করে এবং পরস্পরের মধ্যে যে গড় দূরত্ব থাকে সেটিও বৃদ্ধি পায়। ফলে পদার্থের আয়তনের প্রসার ঘটে।

* একটি লোহার পাত ও একটি পেতলের পাতকে জোড়া লাগিয়ে গরম করতে থাকলে যুগ্ম পাতটি বেঁকে যায় কেন ?

পেতলের প্রসারণ লোহার তুলনায় বেশী। তাই সমান পরিমাণ তাপ প্রয়োগে লোহা অপেক্ষা পেতলের দৈর্ঘ্য বেশী বেড়ে যায়। যেহেতু দুটি জোড়া থাকে তাই পেতলের পাতটা বাহিরের দিক থেকে লোহার দিকে বেঁকে অনেকটা ধনুকের মত হয়ে যায়।

* রিভেট করা কাকে বলে ?

দুটি ধাতব পাতকে একসঙ্গে জোড়া লাগাবার পদ্ধতিকে বলা হয় রিভেট করা। দুটি পাতকে পর পর রেখে মাঝখানে ছিদ্র করা হয়। তারপর একটি পেতল কিংবা লোহার খিলকে উত্তপ্ত করে ঐ ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর দুপাশে হাতুড়ি দিয়ে

ভালভাবে পিটিয়ে জলে ঢেলে ঠাণ্ডা করলে খিলটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং পাত দুটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে।

* তরলের অতি শীতল অবস্থা কী?

প্রত্যেক তরলেরই একটা নির্দিষ্ট হিমাঙ্ক আছে। অর্থাৎ ঐ বিশেষ তাপমাত্রায় তরলটি জমে কঠিনে রূপান্তরিত হয়। বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে তরলকে হিমাঙ্কের নিচে ঠাণ্ডা করা যায় এবং অবস্থায় তরলটিকে বলা হয় অতি শীতল অবস্থা।

* অধিক উত্তপ্ত স্টীম কেমন করে তৈরি করা হয়?

স্টীম তথা জলীয় বাষ্পের উষ্ণতা ১০০° সেন্টিগ্রেড বিশেষ ব্যবস্থায় আবদ্ধ পাত্রে বায়ুমণ্ডলের চাপ অপেক্ষা অধিক বায়ুচাপ প্রদানের ফলে স্টীমের উষ্ণতাকে ১০০° সেন্টিগ্রেডের উপরে আনা যায়। এই অবস্থায় ওকে বলে অতি তপ্ত স্টীম বা সুপার হিটেড স্টীম।

* ধাতব স্কেল দ্বারা কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় নির্ভুল নয় কেন?

ধাতব পদার্থ মাত্রই উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কিছু না কিছু দৈর্ঘ্যে প্রসারিত হয়। আবার উষ্ণতা হ্রাস পেলে দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচনও ঘটে। তাই ধাতব স্কেলে যে দাগ কাটা হয় তা নির্ভুল হতে পারে না। অপরদিকে সব তাপমাত্রায় স্কেলটির দৈর্ঘ্যও ঠিক থাকে না। অতি অল্প হলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রে ত্রুটি এসে যায়। তবে যে ধাতু দ্বারা স্কেলটি নির্মিত তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক জানা থাকলে উষ্ণতা পরিবর্তনের ফলে ত্রুটিটুকু সংশোধন করে নেওয়া যেতে পারে।

* রেল লাইনের পাতে জোড়ের মুখে ফাঁক থাকে কেন?

সূর্যকিরণেও রেলগাড়ীর চাকার ঘর্ষণে রেললাইনের লোহার পাত উত্তপ্ত হয় এবং উত্তপ্ত হওয়ার ফলে তার দৈর্ঘ্যেরও প্রসারণ ঘটে। ফাঁক না থেকে যদি লাইনের পাত জোড়া লাগানো থাকতো তাহলে দৈর্ঘ্য প্রসারণ হেতু লাইন বেঁকে যেতো।

লাইনের জোড়ে একটা লোহার পাতকে চারটে বোল্টের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা থাকে। ঐ পাতটাকে ফিসপ্লেট বলা হয়।

বোল্টের গর্তগুলিকে আবার ডিম্বাকার করা হয়। ফলে প্রসারণ ও সঙ্কোচন উভয় ক্ষেত্রেই দৈর্ঘ্য বাড়তে পারে এবং কমতেও পারে।

* ট্রাম লাইনের পাতে কেন জোড়ার মুখে ফাঁক থাকে না ?

ট্রাম লাইনের পাত যদিও লোহার তৈরী—তবু সে পাত মাটির ভেতরে পোঁতা থাকে। তার চারদিকে থাকে গ্রানাইট পাথর ও কংক্রীট। তাই তাপমাত্রা পার্থক্যের প্রভাব লাইনের উপর খুবই কম পড়ে। উক্ত কারণে পাত প্রসারিত হয়ে বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বলে আদৌ ফাঁক রাখা হয় না।

* পুরু কাচের গ্লাসে গরম জল ঢাললে গ্লাস ফেটে যায় কেন ?

কাচ তাপের অত্যন্ত কুপরিবাহী। পুরু কাচের গ্লাসে গরম জল ঢাললে ভেতরটা উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হয় কিন্তু তাপ সহজে পরিবাহিত হয় না বলে বাহিরটা পূর্বের মত ঠাণ্ডা থেকে যায় এবং প্রসারিত হয় না। এই অবস্থায় ভেতরে ও বাহিরে অসম প্রসারণের জন্য যে বলের সৃষ্টি হয় তাতে গ্লাস ফেটে যায়। পাতলা পাইরেক্স কাচে গ্লাস তৈরী হলে কিন্তু গরম জলের প্রভাবে অসম প্রসারণের সুযোগ থাকে না। তাই এমন গ্লাস ফাটে না, তাছাড়া পাইরেক্স কাচ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে অতি অল্প প্রসারিত হয়। ঐ একই কারণে হ্যারিকেন লণ্ঠনের চিমনি গরম থাকাকালে এক ফোঁটা জল পড়লে ফেটে যায়।

* শিশি-বোতলের মুখে ছিপি এঁটে গেলে গরম করলে খুলে যায় কেন ?

উত্তাপে বোতলের মুখটা একটু প্রসারিত হয় তাই খুলে যায়।

* শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে দোলক ঘড়ি স্লো যায় কেন ?

দোলক যেহেতু ধাতুর তৈরী, তাই গ্রীষ্মকালে দৈর্ঘ্য প্রসারণের জন্য দোলকের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়।

* থার্মোস্ট্যাট যন্ত্রটির কাজ কি এবং কিভাবে তৈরী করা হয় ?

হিটার, বৈদ্যুতিক চুল্লী প্রভৃতির উষ্ণতাকে একটি নির্দিষ্ট পাল্লার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে থার্মোস্ট্যাট যন্ত্রের প্রয়োজন হয়ে থাকে। যন্ত্রটির

প্রধান অংশ পেতল ও ইনভার নামক সঙ্কর ধাতুর রিভেট দেওয়া দুটি পাত। পাত দুটিকে তড়িৎ বর্তনীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। তাপ যখন বেড়ে যায় তখন অসম প্রসারণের জন্য যুগ্ম পাতটির ভেতরের দিকে পেতল থাকে বলে বাহিরের দিকে বেঁকে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ বর্তনী ছিন্ন হয়ে যায়। তখন আর তাপ বাড়তে পারে না। কিছুক্ষণ পরে তাপ হ্রাস পেলে যুগ্ম পাতটি তাপ হারিয়ে সোজা হয়ে যায় এবং পুনরায় তড়িৎ বর্তনীর সঙ্গে সংযোগ ঘটায়। এই উপায়টির জন্যই খুব বেশী তাপ যেমন সৃষ্টি হতে পারে না তেমনই কম তাপেরও সম্ভাবনা থাকে না। তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট পাল্লার মধ্যে ওঠানামা করে।

* ফায়ার এ্যালার্ম কি ?

ফায়ার এ্যালার্মও রিভেট করা দ্বিধাতব পাত। তলাটা একটি তারের মাধ্যমে ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। অপর তারটি উপরে এমন এক অবস্থায় বোতামের সঙ্গে আটকানো থাকে যাতে সব সময় পাতটি ঐ বোতামকে স্পর্শ করতে পারে না। ঐ তারের অপর প্রান্ত এবং ব্যাটারি থেকে তার নিয়ে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

ঐ দ্বিধাতব পাতটির বাহিরের দিকে থাকে পেতল। অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা থাকে এমন জায়গায় ওকে স্থাপন করা হয়। যদি হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় তাহলে পাতটি ভেতরের দিকে বেঁকে যায় এবং বোতামকে স্পর্শ করে। সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ বর্তনী পূর্ণ হওয়ায় বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বেজে উঠে।

* কাচদণ্ডে ধাতব তারকে সীল করা হয় না কিন্তু প্লাটিনাম তারকে করা হয় কেন ?

কাচ ও ধাতু উভয়ে উত্তাপের প্রভাবে সমানভাবে প্রসারিত হয় না। অথচ সীল করতে গেলে উভয়কে উত্তপ্ত করতে হয়। তাই উভয়ের অসম প্রসারণের জন্য সীল করলেই কিছুটা ফাঁক থেকে যাবে। অর্থাৎ বায়ুনিরুদ্ধ হবে না। কিন্তু প্লাটিনামের দৈর্ঘ্য প্রসারণ

গুণাঙ্ক কাচের সমান বলে প্লাটিনামের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই।

* কঠিন কিংবা তরল পদার্থকে উত্তপ্ত করলে তাদের ঘনত্ব ঠিক থাকে কি ?

না। যেহেতু তাপ প্রয়োগে ওদের আয়তনের প্রসারণ ঘটে কিন্তু ভরের পরিবর্তন হয় না। তাই উত্তাপের ফলে পদার্থের ঘনত্ব অবশ্যই কমে যায়।

* জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ (Anomalous expansion) কি ?

উষ্ণতা বৃদ্ধি হেতু যে কোন তরলের আয়তনে প্রসার ঘটে এবং ঘনত্ব কমে যায়। কিন্তু জলের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম আছে। দেখা গেছে, ০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার কিছু পরিমাণ জলকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করতে থাকলে ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি পর্যন্ত আয়তনের প্রসার না ঘটে কেবল সঙ্কুচিতই হতে থাকে। ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এই-সঙ্কোচন হয় চুড়ান্ত। তারপর তাপমাত্রা ৪° সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে উপরে উঠতে থাকলে অন্যান্য সব তরলের মত জলেরও আয়তনের প্রসারণ ঘটে।

যেহেতু ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের আয়তনের সর্বাধিক সঙ্কোচন হয়, তাই তখন তার ঘনত্বও হয়ে উঠে সর্বাধিক। অপরদিকে ০° সেন্টিগ্রেড থেকে ৪° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে জলের ক্ষেত্রে যে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় তা অপরাপর তরল থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। উক্ত কারণে ৪° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত জলের প্রসারণকে ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ বলে।

* শীতপ্রধান দেশসমূহের হ্রদ, জলাশয় ইত্যাদি যখন বরফে বরফে ঢাকা পড়ে যায় তখন সেখানকার জলচর জীবরা কি বেঁচে থাকতে পারে ?

হ্যাঁ পারে। শীতপ্রধান দেশসমূহের বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা যখন শীতকালে হিমাঙ্কের নিচে নামতে থাকে তখন হ্রদ এবং জলাশয়ের জলও ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়। জলরাশির মধ্যে তখন একটি পরিচলন

স্রোতেরও সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ঠাণ্ডা জল ভারী হয়ে নিচে নামতে থাকে এবং নিচের অপেক্ষাকৃত হালকা ও গরম জল উপরে উঠে আসে। এইভাবে পরিচলন স্রোত চলতে থাকায় যখন নিচে জলের ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা হয়ে যাচ্ছে তখন ঐ জল সবচেয়ে ভারী বলে আর উপরে উঠতে পারছে না। আবার যেহেতু জলের তাপমাত্রা ০° সেন্টিগ্রেড না হলে বরফ হয় না, তাই তলার জল কিছুতেই বরফ হতে পারে না অথচ উপরিভাগের জল ঠাণ্ডা আবহাওয়ার স্পর্শে ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে হতে বরফে পরিণত হয়। তলায় ৪° সেন্টিগ্রেডের জল থেকে যাওয়ার ফলেই জলচর প্রাণীদের প্রাণধারণে কোন অসুবিধা হয় না।

* একটি গ্লাসে একখণ্ড বরফ রেখে তাতে ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার জল ঢেলে কানায় কানায় পূর্ণ করা হল। বরফ গললে গ্লাসের জল কি অবস্থায় আসবে?

জল উপচে পড়বে। কারণ বরফের উষ্ণতা ০° সেন্টিগ্রেড। তাকে গলতে যে তাপের দরকার হয় তা ঐ ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার জলই দান করে। ফলে গ্লাসের জলের তাপমাত্রা আর পূর্বের মত থাকবে না। বেশ কিছুটা কমে যাবে। এবং ৪° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা ছাড়া যে কোন উষ্ণতায় জলের আয়তন বেশী হয় বলে গ্লাসের জলের আয়তন বৃদ্ধি পাবে।

* উপরোক্ত পরীক্ষায় গ্লাসে গরম জল ঢাললে কি হবে?

গ্লাসের জলের আয়তন কমে যাবে।

* গ্লাসে বরফখণ্ড রেখে ০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার জলে ভর্তি করে দিলে কি হবে?

জলের আয়তনের কোন পরিবর্তন হবে না। কারণ, জল ও বরফ উভয়ের তাপমাত্রা ছিল ০° সেন্টিগ্রেড এবং বরফ যখন ভাসছিল তখন সে সমান আয়তনের জলকে অপসারণ করছিল।

* হিমমিশ্রণ কাকে বলে?

হিমমিশ্রণ এমন দুটি পদার্থের মিশ্রণ, যাদের মিশ্রণের ফলে

সাধারণ তাপমাত্রায় ওদের একটি কিংবা উভয় গলে যায়। যখন যে গলতে আরম্ভ করে তখন সে মিশ্রণের অন্য পদার্থটি থেকে লীনতাপ গ্রহণ করে এবং তখনই মিশ্রণের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

* কোন্ কোন্ পদার্থ কি কি অনুপাতে মিশ্রিত করে হিমমিশ্রণ তৈরী করা হয় এবং মিশ্রণের ফলে তাদের তাপমাত্রা কত হয়?

১। ৯ : ১ অনুপাতে গুঁড়া বরফ ও সাধারণ খাদ্য লবণ মেশালে যে হিমমিশ্রণ তৈরী হয় তার তাপমাত্রা হয়—২০° সেন্টিগ্রেড। ২। ৩ : ২ অনুপাতে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও গুঁড়া বরফের হিমমিশ্রণে তাপমাত্রা—৫২° সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। ৩। ৫ : ৬ অনুপাতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও সোডিয়াম সালফেট মেশালে যে হিমমিশ্রণ পাওয়া যায় তার তাপমাত্রা হয়—১৭° সেন্টিগ্রেড। ৪। ৪ : ১ অনুপাতে কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা ড্রাই আইসের সঙ্গে ইথারকে মিশ্রিত করলে হিমমিশ্রণের তাপমাত্রা হয়—৭৭° সেন্টিগ্রেড।

* একটি খালি বোতলের মুখে কর্কের ছিপি এঁটে বোতলটিকে গরম করলে ছিপিটা সশব্দে ছিটকে বেরিয়ে আসে কেন?

বোতল খালি বলে মনে হলেও ওর মধ্যে বাতাস থাকে। গরম পেলে বোতলের ভেতরের বায়ু প্রসারিত হয় এবং বাহিরে বেরিয়ে আসার জন্য ভেতরের দেওয়ালের চারদিকে চাপ দেয়। দেওয়াল সে চাপকে বাধা দিলেও মুখের কর্ক বেশীক্ষণ বাধা দিতে পারে না। ভেতরের চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিপি ছিটকে বেরিয়ে আসে।

* দুধ গরম করলে এত উথলায় কেন?

দুধের মধ্যে সর্বদা কিছু বায়ু দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। গরম করলে সেই বায়ু প্রসারিত হয় এবং দুধ তখন উথলাতে থাকে।

* পরম শূন্য কাকে বলে?

চার্লসের সুত্র থেকে তত্ত্বগতভাবে আমরা পাই, চাপ স্থির থাকলে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন প্রতি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হ্রাস কিংবা

বৃদ্ধির জন্য উক্ত গ্যাসের ০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় যে আয়তন ছিল তার $\frac{1}{273}$ অংশ হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি পায়। তাই নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট আয়তনের কোন গ্যাসকে ০° সেন্টিগ্রেড থেকে —২৭৩° সেন্টিগ্রেডে হ্রাস করলে আয়তন একেবারে শূন্য হয়ে যাওয়ার কথা। তাই—২৭৩° সেন্টিগ্রেডকে বলা হয় পরম শূন্য।

* তাপমাত্রার চরম স্কেল বা কেলভিন স্কেল কি?

—২৭৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যে কোন গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যাওয়ার কথা এবং আরও তাপমাত্রা কমালে গাণিতিক নিয়মে আয়তন ঋণাত্মক হয়ে যাবে। বাস্তবে উক্ত ঘটনাকে অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবে এখনও পর্যন্ত এমন কোন গ্যাস আবিষ্কৃত হয়নি যা —২৭৩° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। সব গ্যাস উক্ত তাপমাত্রার বহু আগে তরলে পরিণত হয়ে যায়। অর্থাৎ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে না। তাই গাণিতিক এই নিয়মটিকে যে কোন গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাপমাত্রা মাপক একটি স্কেল উদ্ভাবিত হয়েছে। —২৭৩° সেন্টিগ্রেডের কম তাপমাত্রা আমরা কল্পনা করতে পারি না বলে —২৭৩°কে একেবারে ০ ধরে যে তাপমাত্রার স্কেলটি উদ্ভাবিত তাকে বলা হয়েছে চরম স্কেল। যেহেতু স্কেলটির উদ্ভাবক লর্ড কেলভিন তাই আবিষ্কর্তার নামানুসারে কেলভিন স্কেলও বলা হয়। উক্ত স্কেল অনুযায়ী তাপমাত্রাকে T অথবা °K দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তাপমাত্রার সেন্টিগ্রেড স্কেলের সঙ্গে ২৭৩ যোগ করলেই চরম তাপমাত্রা পাওয়া যায়।

* N. T. P. কথাটির অর্থ কি?

নরম্যাল টেম্পারেচার অ্যাণ্ড প্রেসার বা প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ। ০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাই প্রমাণ তাপ এবং ৭৬০ মি. মি. উচ্চ পারদ-স্তম্ভের চাপ প্রমাণ চাপ।

* গ্যাসের আয়তন প্রকাশের ক্ষেত্রে চাপ ও তাপমাত্রার উল্লেখ অত্যাবশ্যক কেন?

কঠিন কিংবা তরল পদার্থের আয়তন চাপ ও তাপমাত্রা হ্রাসবৃদ্ধির প্রভাবে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয় না। কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রা হ্রাসে বেশ সঙ্কুচিত হয়। অপরপক্ষে চাপ বাড়লে যেমন বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হয় তেমনই চাপ হ্রাস করলে প্রসারণও ঘটে বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে। তাই গ্যাসের আয়তন প্রকাশের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা ও চাপের উল্লেখ একান্তভাবে প্রয়োজন। যদি চাপ ও তাপমাত্রার কোথাও উল্লেখ না থাকে তাহলে ধরতে হবে আয়তনটা N. T. P.তে প্রকাশ করা হয়েছে।

* পদার্থের অবস্থান্তর বলতে কি বোঝায় ?

পদার্থ সাধারণত কঠিন, তরল ও বায়বীয়—এই তিন অবস্থায় থাকে। যদি কোন কঠিনকে তরলে, তরলকে কঠিনে বা বায়বীয় অবস্থায়, বায়বীয় পদার্থকে তরলে কিংবা কঠিনে ইত্যাদি যে কোন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয় তাহলেই বলা হয় পদার্থের অবস্থান্তর ঘটেছে।

* পদার্থের অবস্থান্তর কেমন করে সম্ভব হয় ?

একমাত্র তাপ প্রয়োগ কিংবা তাপ হ্রাসের ফলেই হয়ে থাকে। যেমন কঠিন পদার্থকে ক্রমান্বয়ে তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে প্রথমে তরল ও পরে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। আবার বাষ্পকে শীতল করতে থাকলে প্রথমে তরল ও পরে কঠিনে পরিণতি ঘটে।

* অবস্থান্তরের ক্ষেত্রে পদার্থের আয়তনের কি পরিবর্তন হয় ?

সাধারণ নিয়মে কঠিন তরলে রূপান্তরিত হলে আয়তনের প্রসারণ ঘটে কিন্তু তরল কঠিনে রূপান্তরিত হলে আয়তনের সঙ্কোচন হয়। অপরদিকে গ্যাসকে তরলীভূত করলে সঙ্কুচিত হয় এবং তরলকে গ্যাসে পরিণত করলে আয়তনে প্রসারিত হয়।

* উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম কোথায় কোথায় লক্ষ্য করা যায় ?

জলের ক্ষেত্রে এবং ঢালাই লোহা, পেতল, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ

প্রভৃতি ধাতুর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। জল জমে বরফ হলে আয়তনে বাড়ে এবং অ্যান্টিমনি, বিসমাথ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও আয়তনের বৃদ্ধি পায়।

* হাতে স্পিরিট ফেললে হাতে খুব ঠাণ্ডা অনুভূত হয় কেন ?

স্পিরিট উদ্বায়ী। অর্থাৎ এটি খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু বাষ্পীভূত হতে হলে তাপের দরকার হয়। এক্ষেত্রে অর্থাৎ হাতের উপরে স্পিরিট বাষ্পীভূত হতে থাকলে প্রয়োজনীয় তাপ গ্রহণ করে হাত থেকেই। ফলে হাত তাপ হারায় ও ঠাণ্ডা মনে হয়।

* দেহে যখন ঘাম ঝরতে থাকে তখন পাখার বাতাসে আরাম বোধ হয় কেন ?

পাখার বাতাসে ঘাম দ্রুত বাষ্পীভূত হতে থাকায় বাষ্পীভবনের জন্য তাপ সংগ্রহ করে শরীর থেকে। উক্ত কারণে শরীর তাপ হারায় এবং ঠাণ্ডা ও আরাম লাগে।

* গ্রীষ্মকালে ধাতব পাত্রে রক্ষিত জল অপেক্ষা মাটির কুঁজার জল ঠাণ্ডা হয় কেন ?

মাটির কুঁজোয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে কিন্তু ধাতব পাত্রে এই ধরনের ছিদ্র থাকে না। তাই মাটির কুঁজোর জল ছিদ্রপথে চুঁইয়ে বাহিরে আসে এবং বাষ্পীভূত হয়। আর বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ গ্রহণ করে কুঁজোর জল থেকে। ফলে জল তাপ হারাতে হারাতে ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু ধাতব পাত্রে এই সুবিধাটুকু না থাকায় তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হতে পারে না।

* ব্যায়াম করার পর খোলা জায়গায় এবং ব্যায়াম করার পর খালি গায়ে থাকতে নেই কেন ?

ব্যায়ামের সময় শরীর থেকে প্রচুর ঘাম ঝরে। ব্যায়াম করার পর খোলা জায়গায় এবং খালি গায়ে ঘুরে বেড়ালে দেহের ঘাম দ্রুত বাষ্পীভূত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে তাপ হারাতে হারাতে শরীর

অতিরিক্ত শীতল হয়। এর প্রভাবে দেহের রোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

* চাপের সঙ্গে তরলের স্ফুটনাঙ্কের সম্পর্ক কি ?

প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে তরল পদার্থগুলি এক একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে এবং বাষ্পীভূত হতে আরম্ভ করে। যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যে তরল পদার্থটি বাষ্পে পরিণত হতে আরম্ভ করে সেই তাপমাত্রাকে বলা হয় সেই তরলের স্ফুটনাঙ্ক। কিন্তু এই স্ফুটনাঙ্ক চাপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। চাপ বাড়লে স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে এবং চাপ কমলে স্ফুটনাঙ্ক কমে।

* পর্বতের উপর খোলা পাত্রে রান্না করলে জল, মাংস ইত্যাদি ভাল ভাবে সেদ্ধ হয় না কেন ?

পর্বতের উপর বায়ুর চাপ কম। তাই সেখানে জলও কম তাপমাত্রায় ফুটে বাষ্পীভূত হতে থাকে। উক্ত কারণে উষ্ণতা বৃদ্ধি হতে পারে না এবং কোন কিছু ভালভাবে সেদ্ধও হতে পারে না।

* কম চাপে জল যে কম তাপমাত্রায় ফুটতে আরম্ভ করে—তা কি-ভাবে পরীক্ষা করা হয় ?

একটি ফ্লাস্কে কিছুটা জল নিয়ে গরম করতে থাকলে এক সময় জল ফুটতে আরম্ভ করবে। এই অবস্থায় ফ্লাস্কের মুখে ছিপি এঁটে তাপ দেওয়া বন্ধ করলে জল আর ফুটবে না। তখন ফ্লাস্কটিকে চিমটার সাহায্যে ধরে উপুড় করে উপরে জল ঢালতে থাকলে পুনরায় জল টগবগ করে ফুটবে।

কারণটা খুবই সোজা। প্রথমে জল যখন ফুটছিল তখন ফ্লাস্কের মধ্যে বায়ু ছিল না। যা ছিল তা কেবল জলীয় বাষ্প। ছিপি বন্ধ অবস্থায় উপরে জল ঢাললে ভেতরের জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় জলে পরিণত হয় এবং ভেতরের বাষ্পের চাপও কমে যায়। তাই তাপ দেওয়া বন্ধ সত্ত্বেও জল পুনরায় ফুটতে থাকে।

* ঢাকা দিয়ে রান্না করার সুবিধা কি ?

রন্ধন পাত্রে ঢাকা থাকলে ভেতরে জলীয় বাষ্পের চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে বেশী চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায় এবং তরিতরকারি ইত্যাদি ভালভাবে সেদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়।

* বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কাকে বলে ?

বায়ুতে সব সময় কিছু না কিছু জলীয় বাষ্প থাকে। তবে বর্ষাকালে বেশী থাকে এবং শীতকালে পরিমাণ কমে যায়। বাতাসে আবার জলীয় বাষ্পের ধারণ ক্ষমতা নির্দিষ্ট। তবে তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বাড়ে। কোন এক নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে এবং ঐ উষ্ণতায় ঐ আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হয়, তাদের অনুপাতকে বলা হয় আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

* ভিজা কাপড় বর্ষাকাল অপেক্ষা শীতকালে তাড়াতাড়ি শুকায় কেন ?

শীতকালে বায়ুর উষ্ণতা কম হলে কি হবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও যথেষ্ট কম থাকে। তাই বর্ষাকাল অপেক্ষা শীতকালে আপেক্ষিক আর্দ্রতাও কম। তাই ভেজা কাপড়ের জল সহজে বাষ্পীভূত হওয়ার সুযোগ পায়।

* গরমের দিনে একই তাপমাত্রায় সমুদ্রতীর অপেক্ষা দূরবর্তী অঞ্চল সমূহে গুমোট কম মনে হয় কেন ?

সমুদ্রতীরের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঢের বেশী। গরমের দিনে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে গায়ের ঘাম সহজে বাষ্পীভূত হতে পারে না। কিন্তু সমুদ্র থেকে অধিক দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকে বলে সেসব জায়গায় গায়ের ঘাম সহজে বাষ্পীভূত হয়। তাই সেখানে শরীর তাপ হারিয়ে শীতল হতে পারে এবং গুমোটও কম মনে হয়।

* আবহদপ্তর দৈনিক বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতার হিসাব রাখে কেন ?

আপেক্ষিক আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাওয়া বা হ্রাস পাওয়া অর্থ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস। অতএব জলীয় বাষ্পের পরিমাণ

বাড়লেই বৃষ্টি হবে এবং কমলে বৃষ্টির আদৌ সম্ভাবনা নেই।

* বায়ুর আপেক্ষিক আদ্র'তা কি পরিমাণ থাকলে অস্বস্তিবোধ হয় না ?

সাধারণত বায়ুর আপেক্ষিক আদ্র'তা ৫০% থেকে ৬০% এর মধ্যে থাকলে অস্বস্তিবোধ হয় না।

* শিশির জমে কেন ?

রাত্রিতে পৃথিবী-পৃষ্ঠ বিকিরণের প্রভাবে তাপ হারাতে থাকে। ফলে পৃথিবী-সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতাও ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। ঠাণ্ডা হতে হতে এক সময় বায়ুতে অবস্থিত জলীয় বাষ্প দ্বারা বায়ু সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। উক্ত অবস্থায় আসার পর আরও তাপমাত্রা যখন কমে যায় তখন বায়ু তার সবটুকু জলীয় বাষ্পকে ধরে রাখতে পারে না। কিছু কিছু জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ছোট ছোট জলকণার আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

* বড় বড় গাছের পাতায় যে পরিমাণ শিশির জমে, মাটিতে ঘাসের উপর তার চেয়ে বেশী শিশির জমে কেন ?

শিশির জমার কতকগুলি কারণ আছে। ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন যে-সব বস্তু দ্রুত তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হতে পারে শিশির তাদের উপরেই জমে। তাছাড়া মেঘহীন আকাশ থাকলে, বায়ুমণ্ডলের প্রাথমিক আদ্র'তা বেশী থাকলে এবং বায়ুপ্রবাহ না থাকলে শিশির ভালভাবে জমতে পারে।

যার উপর শিশির জমবে সেটি ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি হলেই ভাল হয়। কেননা বায়ু ঠাণ্ডা হলে ভারী হয়, তাই নিচের দিকেই নামতে থাকে। বড় বড় বৃক্ষ সংলগ্ন বায়ু অবশ্যই ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে সেইখানে অবস্থান করতে পারে না, তাদের মাটির দিকেই নেমে আসতে হয়। এবং অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বাষ্প সেই স্থান দখল করে। কিন্তু নিচের ভারী ও শীতল বায়ু উপরে উঠে আসতে পারে না। উক্ত কারণে ভূ-সংলগ্ন ঘাসের উপর বেশী শিশির জমে।

* আকাশ মেঘলা থাকলে শিশির পড়ে না কেন ?

রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকলে বিকীর্ণ তাপ মেঘে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। তাই তাপ হারিয়ে ভূমি সংলগ্ন বাষ্প শিশিরাঙ্কে পৌঁছোতে পারে না।

* দুটি বরফের টুকরা একসঙ্গে রেখে কিছুক্ষণ চাপ দেওয়ার পর ছেড়ে দিলে টুকরা দুটো জোড়া লেগে যায় কেন ?

কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক চাপের উপর নির্ভর করে। দেখা গেছে, যাদের আয়তন গলনের ফলে হ্রাস পায়, চাপ বৃদ্ধিতে তাদের গলনাঙ্কও হ্রাস পায়। বরফ ঠিক এই জাতীয় পদার্থ।

বরফের টুকরা দুটোকে একসঙ্গে রেখে, চাপ দিলে, চাপের প্রভাবে টুকরা দুটির মধ্যস্থলে বরফের গলনাঙ্ক হ্রাস পায়। অর্থাৎ এই অবস্থায় মধ্যস্থলের তাপমাত্রা ০° সেন্টিগ্রেডের নিচে নেমে যায়। অথচ বরফের তাপমাত্রা ০° সেন্টিগ্রেড। তাই সংযোগস্থলের তাপমাত্রা ০° সেন্টিগ্রেডের নিচে নামলেও আশেপাশে সব জায়গার তাপমাত্রা ০° সেন্টিগ্রেডই থাকে। এই অবস্থায় সংযোগস্থলের বরফ কিছুতেই কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে না। কিছুটা গলে গিয়ে জলে পরিণত হয়। আর ঠিক সেই সময় চাপ দেওয়া বন্ধ করলে চাপ হ্রাসের ফলে গলনাঙ্ক বেড়ে যায়। পূর্বে সংযোগস্থলে যে পরিমাণ বরফ গলে জলে পরিণত হয়েছিল সেগুলি জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হয় এবং টুকরা দুটিও জোড়া লেগে যায়।

* হাতে হাত ঘষতে থাকলে, ফুটবলের ব্লাডারে বায়ু ঢোকাতে গেলে, পেরেকের উপর হাতুড়ি ঠুকলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে গরম হয়ে উঠে কেন ?

সব ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক শক্তির বিনিময়ে তাপের উদ্ভব হয়।

* তাপশক্তি ও যান্ত্রিক শক্তির মধ্যে সম্পর্ক সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করেন ?

১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে জেমস প্রেসকট জুল আবিষ্কার করেন।

* তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা জুল তুল্যাঙ্ক কাকে বলে ?

একক তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কাজের প্রয়োজন হয় তাকেই বলা হয় তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা জুল তুল্যাঙ্ক।

* তাপগতি বিদ্যার প্রথম সূত্রটি কি ?

তাপকে যান্ত্রিক শক্তিতে অথবা যান্ত্রিক শক্তিকে তাপে রূপান্তরিত করলে ঐ তাপ ও যান্ত্রিক শক্তি পরস্পর তুল্যমান হবে। অর্থাৎ যদি **W** পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তিকে কাজে রূপান্তরিত করলে **H** পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে **W**=**H** হবে। অথবা **W**=**JH** হবে। এখানে **J** কে নিত্যসংখ্যা ধরা হয় এবং **J**-ই তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা জুল তুল্যাঙ্ক।

* তাপগতি বিদ্যা কি ?

পদার্থ বিজ্ঞানের যে শাখায় যান্ত্রিক শক্তি ও তাপশক্তির মধ্যে সম্পর্ক এবং একে অন্যে রূপান্তর ইত্যাদি আলোচিত হয় সেই শাখাকে বলে তাপগতি বিদ্যা।

* গ্যাসকে যে আধারে রাখা হয়, সে সেই আধারটির সমগ্র স্থান দখল করে অথচ কঠিন ও তরল তা পারে না কেন ?

পদার্থ মাত্রই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি অণু আকারে অভিন্ন এবং পদার্থের যাবতীয় ধর্ম সবই অণুর মধ্যে বিদ্যমান। অথচ পদার্থের মধ্যে অণুগুলি কখনোই স্থির অবস্থায় থাকে না। অপরদিকে অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে এক রকম বল কাজ করে। সেই বলকে বলা হয় আন্তরাণবিক আকর্ষণ বল। কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে আন্তরাণবিক আকর্ষণ বল এত প্রবল যে, ওদের অণুগুলি ঠাসাঠাসি অবস্থায় কম্পিত হতে থাকে। কিন্তু নিজ নিজ অবস্থান পরিত্যাগ করতে পারে না। তাই কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন দুই-ই আছে। যে কোন আধারে রাখা হোক না কেন আধারের রূপ গ্রহণ করে না। নিজস্ব আকৃতি অবিকৃত থাকে।

তরল পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বল কঠিন পদার্থ থেকে অনেক কম। তাই অণুগুলির মধ্যে দূরত্ব বেশী। তবে আকর্ষণ বলকে উপেক্ষা করে অণুগুলো স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে না। উক্ত কারণে তরলের মধ্যে গড়িয়ে চলার ধর্ম বিদ্যমান। অর্থাৎ যে আধারে তরলকে রাখা হয় সেই আধারের রূপ গ্রহণ করে। তবে তরলের নিজস্ব আয়তন আছে।

গ্যাসের ক্ষেত্রে আন্তরাণবিক আকর্ষণ বল অত্যন্ত ক্ষীণ। ফলে গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলি সেই আকর্ষণ বলকে উপেক্ষা করে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে এবং যে আধারে রাখা হয় সেই আধারটির মধ্যে চারিদিকে অবিরাম গতিতে ছুটাছুটি করতে থাকে। আবার আধারের গায়ে ধাক্কা খেয়ে অণুগুলির গতির দিকেও পরিবর্তিত হয়। যদি ধাক্কা না খেতো তাহলে সরলরেখায় চলতে থাকতো। এইসব কারণে গ্যাস মাত্রই যে আধারে থাকে সেই আধারটির সমগ্র স্থান দখল করে এবং নিজস্ব কোন আকার ও আয়তন কিছুই নেই।

* তাপের প্রভাবে পদার্থের অবস্থান্তর ঘটে কেন ?

পদার্থ কঠিন, তরল কিংবা বায়বীয় যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন তাদের অণুগুলি স্থির ও নিশ্চল নয়। তাপের প্রভাবে ওদের আন্তরাণবিক আকর্ষণ বল দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে অণুগুলোর মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সেই বিশৃঙ্খলার পরিণতিই পদার্থের অবস্থান্তর।

* তাপের সুপরিবাহী ও কুপরিবাহী বলতে কি বোঝায় ?

যে সমস্ত পদার্থের ভেতর দিয়ে তাপ সহজে সঞ্চালিত হতে পারে তাদের বলা হয় সুপরিবাহী এবং যাদের ভেতর দিয়ে তাপ সহজে চলাচল করতে পারে না তাদেরই বলা হয় কুপরিবাহী। সব ধাতু, গ্রাফাইট ইত্যাদি তাপের সুপরিবাহী। কাঠ, কাচ, পারদ ব্যতীত সমস্ত তরল এবং সব গ্যাস কুপরিবাহী।

* একটি ধাতব দণ্ডের একপ্রান্ত উনানে রাখলে অন্য প্রান্ত গরম হয়ে

উঠে কেন ?

দণ্ডের যে প্রান্ত উনানে থাকে সেই প্রান্তের অণুগুলি উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং তাদের স্পন্দন বেড়ে যায়। তখন অণুগুলি তাদের অবস্থান পরিত্যাগ না করলেও তাদের স্পন্দন বৃদ্ধি পেলে পার্শ্ববর্তী অণুগুলিতেও সেই স্পন্দন সঞ্চালিত হয় এবং তাপ পরিবহণ করে। অপর দিকে ধাতুর মধ্যে বহুসংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। এরা ধাতুর মধ্যে যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং তাপকে দ্রুত পরিবহণ করে অন্যত্র নিয়ে যায়। কিন্তু কাঠ প্রভৃতি কুপরিবাহীর ক্ষেত্রে অণুগুলির স্পন্দন বাড়লেও ধাতুর মত মুক্ত ইলেকট্রন এদের মধ্যে থাকে না। তাই তাপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে না।

* জল গরম হলে যে হালকা হয়ে উপরে উঠে—এই সত্য কিভাবে প্রমাণ করা যায় ?

একটি ফ্লাস্কের অর্ধেকের বেশী জলে ভর্তি করে এবং তলায় একটুকরা তুঁতে ফেলে রেখে গরম করতে থাকলে তলা থেকে নীল জলধারা উপরে উঠতে দেখা যাবে।

* উনানের পাশে দাঁড়ালে আমরা গরম পাই কেন ?

তাপ তিন উপায়ে ছড়িয়ে পড়ে। উপায় তিনটি হল পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ। পরিবহণ ও পরিচলনের জন্য জড় মাধ্যমের আবশ্যক হয়ে থাকে। কিন্তু জড় মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াও বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ সরলরেখায় সবদিকে চলাচল করতে পারে। তথা তরঙ্গাকারে এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। আমাদের দেহ থেকে যে পরিমাণ বিকীর্ণ শক্তি নির্গত হয়, উনানের কাছে থাকলে উনান থেকে অনেক বেশী বিকীর্ণ শক্তি আমাদের দেহে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না এবং মাধ্যম থাকলে মাধ্যম উত্তপ্তও হয় না। কেবল উনান থেকে নয়, উক্ত উপায়ে আমরা সূর্যের তাপও পেয়ে থাকি।

* তাপের ব্যাপনতা (Diffusivity) কাকে বলে ?

তাপ যখন কোন মাধ্যমের ভেতর দিয়ে পরিবাহিত হয় তখন কিছু কিছু তাপ মাধ্যমের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু তাপ বিকিরিতও হয়। উভয়ের মিলিত অবস্থাকে বলা হয় ব্যাপনতা।

* বয়লার তামা দিয়ে তৈরি হয় কেন ?

তামা উত্তম তাপ পরিবাহী। তাই কেবল বয়লার নয়, রান্নার বাসনপত্রও অনেক সময় তামা দিয়ে তৈরি করা হয়। তবে উল্লেখ করতে হয় যে, ধাতুর মধ্যে রূপাই সবচেয়ে ভাল পরিবাহী। রূপার দাম বেশী বলে ও সব কাজে ব্যবহার করা হয় না।

* পাতলা কাগজের ঠোঙায় জল রেখে জলকে ফোটানো যায় কিন্তু মোটা কাগজের ঠোঙায় পারা যায় না কেন ?

পাতলা কাগজের ভেতর দিয়ে অতি সহজে তাপ সঞ্চালিত হতে পারে। তাই একটা বার্ণারের উপর তারজালিতে পাতলা কাগজের ঠোঙায় জল রেখে উতপ্ত করলে কাগজ পোড়ে না এবং জলও ফুটে বাষ্পীভূত হয়। কিন্তু মোটা কাগজ তাপের কুপরিবাহী বলে তাপ সহজে সঞ্চালিত হতে পারে না। উত্তপ্ত হয়ে জ্বলনাঙ্কে পৌছে আগুন ধরে যায়।

* একটি জ্বলন্ত বার্ণারের শিখায় তারজালি ধরলে শিখা উপরে উঠতে পারে না কেন ?

ধাতব তার তাপের অত্যন্ত সুপরিবাহী। শিখার উপর তারজালি ধরলে তাপ দ্রুত জালির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বলে শিখা উপরে উঠতে পারে না।

* একটি কাঠের দণ্ডে এবং একটি ধাতব দণ্ডের চারদিকে আলাদা আলাদাভাবে পাতলা কাগজ জড়িয়ে একই সময়ে আগুনের শিখায় ধরলে কোনটি আগে পুড়বে এবং কেন ?

কাঠের দণ্ডে জড়ানো কাগজটাই আগে পুড়বে। কারণ, কাঠ তাপের কুপরিবাহী। কাগজের তাপকে সে সহজে গ্রহণ করতে পারে

না। অপরপক্ষে ধাতব দণ্ড কাগজের তাপকে কিছুটা শোষণ করে নেয়। ফলে কাঠের উপর জড়ানো কাগজ আগে জ্বলনাঙ্কে পৌঁছে যায়।

* প্রেসার কুকারের হাতলে ইবোনাইট এবং কেট্‌লীর হাতলে বেতের পাত জড়ানো থাকে কেন ?

কুকার ও কেট্‌লী উভয়ে ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে। ধাতু যেহেতু তাপের সুপরিবাহী, তাই সহজে ওরা গরম হয়ে উঠে। কিন্তু আগুনে বসাতে এবং নামাতে হয় বলে গরম অবস্থায়ও হাতে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই তাদের হাতলে কুপরিবাহী পদার্থ ইবোনাইট, বেতের পাত ইত্যাদি জড়ানো থাকে।

* শীতকালে পশমের পোষাক ব্যবহার করা হয় কেন ?

পশমের পোষাকে থাকে অসংখ্য রন্ধ্র এবং সে রন্ধ্রগুলি বায়ুপূর্ণ থাকে। বায়ু আবার তাপের অত্যন্ত কুপরিবাহী, তাই বায়ুর কুপরিবাহী স্তর ভেদ করে শরীরের তাপ যেমন বাহিরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না, অপরদিকে তেমনই বাহিরের ঠাণ্ডাও প্রবেশ করতে পারে না।

* শীতে একখানা মোটা জামার বদলে দু-তিনখানা অতি পাতলা জামা গায়ে দিলে বেশী গরম বোধ হয় কেন ?

দু-তিনখানা জামা গায়ে থাকলে দুটির মাঝখানে থাকে এক একটি বায়ুস্তর। কুপরিবাহী বায়ুস্তরগুলির সংখ্যা বেশী হয় বলে শরীরের তাপ স্তরগুলি ভেদ করে বাহিরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

* টিনের ছাউনি অপেক্ষা খড়ের ছাউনি ঘরে অধিক আরাম বোধ হয় কেন ?

টিন তাপের সুপরিবাহী কিন্তু খড় কুপরিবাহী। বাহিরের গরম ও ঠাণ্ডা দুইই টিনের দ্বারা সঞ্চালিত হতে পারে কিন্তু খড়ের দ্বারা কোনটিই পারে না।

* হ্যারিকেন লণ্ঠনের তলদেশে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে কেন ?

হ্যারিকেন যখন জ্বলতে থাকে তখন ভেতরের বায়ু উত্তপ্ত ও

হালকা হয়ে বেরিয়ে যায় এবং তলার ছিদ্র দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ভেতরে প্রবেশ করে। যেহেতু কোন শিখাই অক্সিজেনের অভাবে জ্বলতে পারে না, তাই ঐ ছিদ্রের মাধ্যমে বায়ুর পরিচলন স্রোত বজায় থাকায় অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটে না।

* আলোককে এবং তাপকে কেবলমাত্র অনুভব করি কিন্তু দেখতে পাইনা কেন ?

বেতার-রশ্মি, তাপ-রশ্মি আলোক-রশ্মি, রঞ্জন-রশ্মি প্রভৃতি সবই বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি। অন্যান্যদের মত তাপও শূন্য মাধ্যমে তরঙ্গাকারে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত বেশী তাদের উপস্থিতি তত কম অনুভব করা যায়। আলোক তরঙ্গ অপেক্ষা তাপের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী বলে চোখে না দেখে কেবল অনুভব করা যায়। আবার বেতার-তরঙ্গ প্রভৃতি যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাপের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বেশী তাদের অনুভবই করা যায় না।

* রান্নার পাত্র হিসাবে কালো মাটির হাঁড়ি এবং চমচকে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি—কোনটি উপযোগী ?

কালো মাটির হাঁড়িই অধিক উপযোগী। মাটির হাঁড়ির তলদেশ কালো ও অমসৃণ থাকে বলে উনান থেকে তাপ বিকীর্ণ হতে পারে না। কিন্তু চকচকে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির তলদেশ থেকে তাপ বিকীর্ণ হয়ে যায়।

* উনানের উপরের দিকে বেশী তাপ লাগে কিন্তু পাশের দিকে তত লাগে না কেন ?

উপরের হাওয়া গরম ও হালকা হয়ে উপরে উঠতে থাকে এবং পাশ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার পরিচলন স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে ?

* গ্রীষ্মকালের বিকেলে প্রায় ঝড় উঠে কেন ?

গ্যাসীয় পদার্থ মাত্রই উত্তপ্ত হলে হালকা হয় এবং প্রসারিত হয়। বায়ুতে কোনো জায়গায় দুটি স্থানের মধ্যে তাপমাত্রার যদি তারতম্য ঘটে অর্থাৎ এক জায়গায় বায়ু যদি উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং পাশাপাশি

অঞ্চল যদি অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত হয় তাহলে উত্তপ্ত স্থানের বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠবে আর শীতল ও ভারী বায়ু চারদিক থেকে ছুটে এসে তার স্থান দখল করবে। কিন্তু স্থানটি উত্তপ্ত বলে ছুটে আসা বায়ু পুনরায় উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং আবার তার স্থান দখল করবে শীতল বায়ু। এইভাবে একটা পরিচলন স্রোতের ফলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

গ্রীষ্মকালে তুপুরের পর বিভিন্ন অঞ্চলে নানা কারণে তাপমাত্রার মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য এসে যায়। আর যত বেশী পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তত জোরে ঝড় বহিতে থাকে।

* স্কুল ঘরে সোজাসুজি বড় বড় দরজা জানালা রাখা হয় কেন ?

ছাত্রদের উপস্থিতিতে ঘরের বাতাস গরম হয়ে প্রসারিত হয়। তা ছাড়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। এদের নিষ্কাশন করা এবং নির্মল বায়ুর প্রবাহ ঠিক রাখতে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

* 0°C উষ্ণতার জল অপেক্ষা 0°C উষ্ণতার বরফ অধিক ঠাণ্ডা কেন ?

0°C উষ্ণতার জল বরফে পরিণত হতে হলে তাকে ৮০ ক্যালরি/গ্রাম তাপকে বর্জন করতে হয়। তাই বেশী ঠাণ্ডা মনে হয়।

* গরমের সময় সাদা পোষাক এবং শীতে কালো পোষাক আরামপ্রদ কেন ?

সাদা পোষাক সূর্য থেকে বিকীর্ণ তাপকে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দেয় তাই সাদা পোষাক সহজে গরম হতে পারে না। অপর দিকে কালো পোষাক সূর্য থেকে বিকীর্ণ তাপ শোষণ করে গরম হতে পারে।

* কারশফ সূত্রের মূল কথা কি ?

যে বস্তু যত ভাল তাপ শোষণ করতে পারে সে বস্তু তত ভাল বিকিরক।

* গ্রীষ্মকালে ছাতার উপর সাদা কাপড়ের আস্তরণ ব্যবহার করলে

কতটুকু সুবিধা পাওয়া যায় ?

সাদা কাপড় সূর্যের বিকীর্ণ তাপকে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দেয় বলে ভেতরের কালো কাপড় ততটা গরম হতে পারে না। ফলে ব্যবহারকারী কিছুটা আরাম পায়।

* আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু কাকে বলে ?

কৃষ্ণ বস্তু বা কালো রঙের বস্তু মাত্রই তাপ শোষণ করে নেয়। তবে যে কালো রঙের বস্তু তার উপর আপিতত সমস্ত বিকিরণকে শোষণ করে নিতে পারে তাকেই বলা হয় আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু।

তবে এও সত্য যে, পৃথিবীতে এমন কোন কৃষ্ণ বস্তুকে লাভ করা যায় না– যে আপতিত বিকিরণের পুরোটাই শোষণ করতে পারে। আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু হিসাবে যে প্লাটিনাম ভুষা ব্যবহার করা হয় সেও আপতিত বিকিরণের শতকরা ৯৮ ভাগ শোষণ করতে পারে বাকি দুভাগকে পারে না।

* স্টিফান ধ্রুবকের মান কত ?

৫.৬৭ × ১০^-৫ আর্গ/সেমি²/সেকেণ্ড/°কেলভিন⁴ ।

* স্টিফান সূত্র কোথায় প্রয়োগ করা হয় ?

বিকীর্ণ তাপ হিসাবের কাজে। এমন কি সূত্রটি প্রয়োগ করে সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রারও মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। সূত্রটি থেকে সূর্যপৃষ্ঠের লব্ধ তাপ ৬০০০° কেলভিনের মত।

* স্টিফান সূত্রটি কি ?

একটি আদর্শ কৃষ্ণ বস্তুর প্রতি একক ক্ষেত্রফল থেকে প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ হয় তা বস্তুটির পরম উষ্ণতার চতুর্থ ঘাতের সমানুপাতী।

অর্থাৎ $E \propto T^4$ [E = একক ক্ষেত্রফল থেকে নির্গত শক্তি এবং T = গরম উষ্ণতা]

বা $E = \sigma T^4$ [σ (সিগমা) = স্টিফানের ধ্রুবাঙ্ক।]

* ঠাণ্ডা ঘরে রাখা একটুকরা কাঠ এবং একটুকরা ধাতব পাতের উপর

হাত দিলে ধাতব পাতকে অধিক ঠাণ্ডা মনে হয় কেন ?

ধাতব পাত তাপের সুপরিবাহী বলে হাত থেকে তাপ শোষণ করে নিতে পারে কিন্তু কাঠ পারে না। উক্ত কারণে পাতকে ঠাণ্ডা মনে হয়।

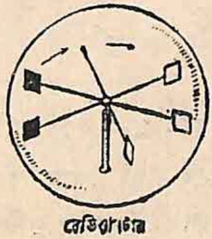
* শীতপ্রধান দেশে গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু উষ্ণ রাখার জন্য কী ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ?

এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় রেডিয়েটর নামক যন্ত্র। উত্তপ্ত জল অথবা স্টীমে ভর্তি এই যন্ত্র থেকে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে এবং নিয়মিত-ভাবে তাপরশ্মি বিকিরিত হয়। ফলে গৃহের বায়ু উষ্ণ থাকে।

* বিকিরিত তাপশক্তিকে কীভাবে পরিমাপ করা হয় ?

রেডিও মিটার নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে। যন্ত্রের প্রধান অংশ প্রায় বায়ুশূন্য একটি আধার এবং তার মধ্যে একটা দণ্ডের মাথায় সমান দৈর্ঘ্যের কতকগুলো সরু দণ্ড থাকে। ঐ সরু দণ্ডের শেষপ্রান্তে থাকে এক একটি ধাতব চাকতি। ঐ চাকতিগুলোর একপাশ থাকে উজ্জ্বল আর অপর পাশটিকে কালো করে দেওয়া হয়। ঐ দণ্ডগুলি আধারের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে পারে।

যেহেতু কালো বস্তু অধিক তাপ শোষণ করতে পারে তাই কোন উত্তপ্ত পদার্থের নিকটে আসলে চাকতির কালো দিকটা উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপরশ্মিকে দ্রুত শোষণ করে নেয়। এর ফলে যন্ত্রের মধ্যে যে অতি অল্প পরিমাণ বায়ু থাকে তাতে একমুখী একটা বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। ওতে মূল দণ্ডের মাথায় স্থাপিত চাকতিগুলো ঘুরতে থাকে। চাকতিগুলোর ঘূর্ণনের বেগ লক্ষ্য করে বিকিরিত তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়।



রেডিওমিটার

* থার্মোফ্লাস্কে রক্ষিত পদার্থের তাপমাত্রা অধিকক্ষণ বজায় থাকে কেমন করে ?

চলতি কথায় থার্মোফ্লাস্ক বলা হলেও ওর আর একটা নাম ডিউয়ার ফ্লাস্ক। এটি একধরনের কাচপাত্র। এর দুটি কাচের দেওয়াল এবং দু'দেওয়ালের মধ্যে অল্প ফাঁক রাখা হয়। ঐ ফাঁকা জায়গাটা বায়ুশূন্য করে করে দেওয়া হয়। অপরদিকে ভিতরের দেওয়ালে বাহিরের দিকটাতে পারদঘটিত একটা আস্তরণও থাকে। বায়ুর সংস্রব না থাকায় এবং পারদের আস্তরণের জন্য তাপের বিকিরণ অনেকখানি কমে যায়। পাত্রের মুখে কর্কের ছিপি এবং ব্যবহারের সুবিধার জন্য একটা ধাতুনির্মিত আধারের মধ্যে বসানো থাকে।

শব্দ

* শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হয় ?

জড়বস্তুর কম্পনের ফলেই শব্দ উৎপন্ন হয়।

* শব্দ কেমন করে আমরা শুনতে পাই ?

কম্পনের যান্ত্রিক শক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই শব্দশক্তি কানের পর্দাকে কম্পিত করে। সেই কম্পন স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হলেই আমাদের শ্রবণের অনুভূতি জাগে।

* শব্দের প্রবাহের জন্য কি জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় ?

যেহেতু শব্দতরঙ্গ বায়ু অথবা অন্য কোন পদার্থের অণুতে কম্পন সৃষ্টি করেই অগ্রসর হয় তাই শব্দের ক্ষেত্রে জড় মাধ্যমের অবশ্যই প্রয়োজন হয়।

* প্রতিধ্বনি কি ?

শব্দ কোন দৃঢ় তলে বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ উৎস থেকে যে বেগে গমন করে বাধা পেয়ে সেই বেগেই ফিরে আসে। অরণ্য, পর্বত, ঘর-বাড়ী ইত্যাদিই শব্দের প্রতিফলক। অল্প স্থিতিকালের

কোন শব্দ প্রতিফলকে প্রতিফলিত হওয়ার পর পুনরায় ফিরে আসে এবং শোনা যায়। অনুরূপ প্রতিফলিত শব্দের পুনঃশ্রুতিকেই বলা হয় প্রতিধ্বনি।

* প্রতিধ্বনি শুনতে হলে প্রতিফলকের দূরত্ব কমপক্ষে কত হওয়া উচিত ?

অল্প স্থিতিকালের শব্দ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী শব্দ যথা বোমা, পটকা, গুলি, হাততালি ইত্যাদি আমাদের কানে যে অনুভূতির সৃষ্টি করে তা প্রায় $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ডে ধরে স্থায়ী হয়। ঐ $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে যদি শব্দটি ফিরে আসে তাহলে আমরা প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো না। অতএব প্রতিফলকের দূরত্ব এমন হওয়া উচিত যাতে শব্দ উৎস থেকে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসতে যেন $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ড সময়ের বেশী লাগে।

সাধারণত বায়ুতে শব্দের বেগ ১১২০ ফুট বা ৩৪০ মিটার/সেকেণ্ড। $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ড সময়ে মোট দূরত্ব অতিক্রম করবে ১১২ ফুট বা ৩৪ মিটার। যেহেতু শব্দ প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে দুবার পথ অতিক্রম করতে হয় তাই প্রতিফলক কমপক্ষে $\frac{১১২}{২}$ ফুট বা ৫৬ ফুট কিংবা $\frac{৩৪}{২}$ বা ১৭ মিটার দূরে থাকা আবশ্যক।

কিন্তু অর্থবাহী শব্দের ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম হবে। সাধারণত এক শব্দাংশ যুক্ত শব্দ উচ্চারণে আমাদের প্রায় $\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ড সময় লাগে। যদি "ক" সংখ্যক শব্দ উচ্চারণ করতে হয় তাহলে সময় লাগবে $\frac{ক}{৫}$ সেকেণ্ড। যদি বায়ুতে শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩৪০ মিটার হয় তাহলে প্রতিফলকের দূরত্ব হতে হবে $\frac{ক \times ৩৪০}{৫} \div ২$ মিটার বা $\frac{ক \times ৩৪০}{১০}$ মিটার বা ক $\times$ ৩৪ মিটার। "ক" যদি ১ হয় অর্থাৎ এক শব্দাংশযুক্ত শব্দের প্রতিধ্বনি যদি শুনতে হয় তাহলে প্রতিফলকের

দূরত্ব হবে ১ × ৩৪ মিটার ৩৪ বা মিটার।

* অণুরণন কেন হয় ?

সাধারণত বড় বড় হল ঘরে কোন শব্দ হওয়ার পর গমগম করতে থাকে কিন্তু স্পষ্ট কোন শব্দ শোনা যায় না। একেই বলে অনুরণন। অনুরণনের কারণ, কোন উচ্চারিত শব্দ থেমে যাওয়ার পরও ঘরের দেওয়ালে বার বার প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

* অনুরণন বন্ধ করার উপায় কি ?

শব্দ শোষণ করতে পারে এমন পদার্থ যেমন কার্পেট, কাপড়ের পর্দা ইত্যাদি দেওয়ালে থাকলে অনুরণন বন্ধ হয়। বেশী লোকজন থাকলেও অনুরণন কম হয়। কারণ মানুষের দেহ এবং তাদের পোষাক পরিচ্ছদ শব্দ শোষণে সক্ষম।

* কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শব্দের প্রতিফলন নিয়মকে প্রয়োগ করা হয় ?

সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত পাহাড় অথবা কোন জাহাজের অবস্থান নির্ণয়ে অথবা মাছের অনুসন্ধানে শব্দকে প্রতিফলিত করিয়ে ফিরিয়ে আনা হয়। তাছাড়া স্টেথোস্কোপ প্রভৃতি যন্ত্র নির্মাণ প্রেক্ষাগৃহে শব্দবিন্যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও শব্দের প্রতিফলনকে কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

* শব্দকে প্রতিফলিত করিয়ে কেমন করে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয় ?

যেখানকার গভীরতা নির্ণয় করতে হবে সেইখানে জাহাজে করে উপস্থিত হতে হয়। জাহাজটির একপ্রান্তে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে শব্দপ্রেরক যন্ত্র এবং হাইড্রোফোন। শব্দপ্রেরক যন্ত্রটি থেকে ক্ষণস্থায়ী শব্দ সৃষ্টি করা হলে সেই শব্দ তলায় প্রতিফলিত হয়ে হাইড্রোফোনে ধরা পড়ে। যদি জলে শব্দের গতিবেগ v ফুট/সেকেণ্ড হয় এবং যদি t সেকেণ্ড সময় অন্তে প্রতিধ্বনি শোনা যায় তাহলে সমুদ্রের গভীরতা হবে $\frac{vt}{২}$ ফুট। কেন না এক্ষেত্রেও শব্দকে দুবার পথ অতিক্রম করতে হয়।

* প্রতিধ্বনির সাহায্যে প্রেক্ষাগৃহের শব্দবিন্যাস কিভাবে করা হয় ?

গৃহাভ্যন্তরের ছাদ ও মঞ্চের পেছনের দেওয়ালকে অবতল করা হয়। ফলে শব্দ প্রতিফলনের সুবিধা হয় এবং প্রতিফলনের দ্বারা সমস্ত শ্রোতা ভালভাবে শুনতে পায়। তবে অনুরণন যাতে না হয় তার জন্য উপযুক্ত শব্দশোষক ব্যবহার করা হয়।

* বায়ুতে শব্দের বেগের উপর উষ্ণতা ও আর্দ্রতার প্রভাব কি ?

বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে এবং আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে উভয় ক্ষেত্রেই ঘনত্ব কমে এবং শব্দের গতিবেগ বেড়ে যায়। দেখা গেছে প্রতি ১° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে শব্দের বেগ ৬১ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আর্দ্রতা বৃদ্ধিতে শব্দের বেগ অতি সামান্যই বাড়ে। এমনকি বাতাস জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে পড়লে শব্দের বেগ শুষ্ক বায়ুর তুলনায় মাত্র ০·৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

* গভীর রাত্রিরে অতি দূরের শব্দও স্পষ্ট শোনা যায় কেন ?

দিবাভাগে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় এবং উত্তপ্ত হয় ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত বায়ু। উপরের দিকে বায়ু ক্রমশ শীতল। যেহেতু উষ্ণতা বৃদ্ধিতে শব্দের বেগ বাড়ে এবং উষ্ণতাহ্রাসে শব্দের বেগ হ্রাস পায়। উক্ত কারণে দিবাভাগে শব্দতরঙ্গ অগ্রসর হতে হতে ধীরে ধীরে উপরের দিকে বেঁকে যায়। তাই দিনেরবেলায় কিছু দূরত্বের পর শব্দকে আর শোনা যায় না। কিন্তু রাত্রিতে উল্টো ব্যাপার ঘটে থাকে। ভূপৃষ্ঠ হয় শীতল। উপরের দিকে থাকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বায়ু। এই অবস্থায় শব্দতরঙ্গ উর্ধ্বমুখী না হয়ে নিম্নমুখী হয়। গভীর রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠ আরও শীতল হয়। তখন নিম্নমূখী শব্দতরঙ্গ বহুদূর থেকে ভেসে আসার সুযোগ পায়।

* গভীর সমুদ্রের তলদেশে শব্দের প্রতিফলন সম্ভব হয় না কেন ?

সাগরের জলে গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা কমতে থাকে। উষ্ণতা কমলে শব্দের বেগও কমতে থাকে। এছাড়া আছে লবণাক্ততার প্রভাব। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠে শব্দের গতিবেগ যেখানে সেকেণ্ডে ১৫২০ মিটার,

মাত্র এক কিলোমিটার গভীরে কমতে কমতে ১৪৮০ মিটার/সেকেণ্ড হয়ে যায়। এইভাবে শব্দতরঙ্গ যতই নিচের দিকে অগ্রসর হয় ততই বেগ কমতে থাকে এবং এক সময় শব্দতরঙ্গের গতি উর্ধ্বমুখী হয়। উক্ত কারণে খুব বেশী গভীরতায় শব্দতরঙ্গ পৌঁছতে পারে না।

* সুরসমৃদ্ধ শব্দ ও সুরবর্জিত শব্দ কাকে বলে ?

যে শব্দ আমাদের কানে মধুর অনুভূতি সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় সুরসমৃদ্ধ শব্দ এবং যে শব্দ বিরক্তি উৎপাদন করে তাকে বলা হয় সুরবর্জিত শব্দ। সাধারণত শব্দের উৎস নিয়মিতভাবে পর্যাবৃত্ত গতিতে কম্পিত হলে সুরসমৃদ্ধ শব্দের উদ্ভব হয় এবং উৎসের অনিয়মিত কম্পনে সৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী শব্দই সুরবর্জিত শব্দ।

* পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের গলার স্বর মিহি কেন ?

মেয়েদের গলার স্বরের কম্পাঙ্ক বেশী। স্বরযন্ত্রে যে দুটি পাতলা পর্দা থাকে তার মধ্যে যে ফাঁকটা থাকে সেটি খুবই কম এবং পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদের আরও কম। ফুসফুস থেকে বাতাস যখন ঐ ফাঁক দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসতে থাকে তখন পর্দা দুটি কাঁপতে থাকে। মেয়েদের ফাঁকটা কম হওয়ার জন্য কম্পাঙ্ক বেশী তথা স্বর তীক্ষ্ণ। অধিক সময় মেয়েরা কথা বললেও পুরুষদের মত হাঁপিয়ে উঠে না।

* সুর ও স্বর কাকে বলে ?

কোন উৎস প্রতি সেকেণ্ডে যত সংখ্যক পূর্ণ কম্পন সম্পাদন করে তাকেই বলে কম্পাঙ্ক এবং কোন সুরসমৃদ্ধ শব্দের যদি একটি মাত্র কম্পাঙ্ক থাকে তাহলে তাকে বলা হয় সুর। আর সুরসমৃদ্ধ শব্দই স্বর। অপরদিকে স্বরকে বিশ্লেষণ করলে যে একাধিক সরলতম শব্দ পাওয়া যায় তারা প্রত্যেকেই সুর। তাই বলা হয়, সব সুরই স্বর কিন্তু সব স্বর সুর নয়।

* মূলসুর ও উপসুর কাকে বলে ?

স্বরের মধ্যে একাধিক কম্পাঙ্কের শব্দ থাকে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম কম্পাঙ্কের সুরকে বলা হয় মূলসুর অবশিষ্ট সুরগুলিই

উপস্বর। মূল স্বরের পরে ক্রমশ উচ্চতর কম্পাঙ্কগুলি যথাক্রমে প্রথম উপস্বর, দ্বিতীয় উপস্বর ইত্যাদি। উপস্বরগুলির মধ্যে যেগুলি মূল স্বরের গুণিতক সেগুলিকে বলা হয় সমমেল।

* শব্দের তীব্রতা কাকে বলে ?

শব্দতরঙ্গ তার সঞ্চার পথের উপর লম্ব এমন একক ক্ষেত্রফলের ভেতর দিয়ে যে হারে শক্তি পরিবাহিত করে তাকেই বলে তীব্রতা। উৎস আকারে বড় হলে তীব্রতা বাড়ে। দূরত্ব বাড়লে তীব্রতা কমতে থাকে।

* তারের বাদ্যযন্ত্রে ফাঁপা কাঠের বাক্স ব্যবহার করা হয় কেন ?

তারের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটার মধ্যে বায়ুরও কম্পন হয়। ফলে শব্দের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এখানে সংযুক্ত বস্তুর অনুনাদী কম্পনের ফলে শব্দের তীব্রতা বৃদ্ধির উপায় মাত্র।

* বেহালা, সেতার, গীটার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজানোর সময় আঙ্গুল অথবা ধাতব বেলন দিয়ে চাপতে হয় কেন ?

তারকে চাপার ফলে তারের দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের পরিবর্তন হয়। ফলে বিভিন্ন চড়া অথবা খাদের স্বর সৃষ্টি হয়।

* ফুঁ দিলে শিঙা, শাঁখ ইত্যাদি বাজে কেমন করে ?

শিঙা, শাঁখ ইত্যাদির মধ্যে থাকে বায়ুস্তম্ভ। ফুঁ দিলে বায়ুস্রোত রন্ধ্রপথে গিয়ে অভ্যন্তরস্থ বায়ুস্তম্ভ ঘূর্ণি ও কম্পন সৃষ্টি করে। ফলে উৎপন্ন হয় তীব্র অনুনাদী কম্পন। এক্ষেত্রে বায়ুস্তম্ভ বক্র বলে অনুরূপ জোরালো শব্দ পাওয়া যায়।

* শ্রবণোত্তর তরঙ্গ কাকে বলে ?

সাধারণ কোন উৎস সেকেণ্ডে ২০ বারের কম এবং, ২০০০০ এর বেশী বার কাঁপতে থাকলে সে শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। এই জাতীয় শব্দ অর্থাৎ ২০-র কম ও ২০০০০ এর বেশী কম্পাঙ্কের শব্দকে বলা হয় শ্রবণোত্তর তরঙ্গ। আজকাল ২০,০০০ এর ঢের বেশী কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

* শ্রবণোত্তর তরঙ্গের ব্যবহারিক প্রয়োগগুলি কি কি ?

বেশী কম্পাঙ্কযুক্ত শ্রবণোত্তর তরঙ্গ খুব শক্তিশালী এবং চারদিকে বিক্ষিপ্ত না হয়ে সরলরেখায় অগ্রসর হয় বলে মাধ্যমের দ্বারা খুব কম পরিমাণে শোষিত হয়। তাই বহু কাজে ওকে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে জল, দুধ ও খাদ্যদ্রব্যকে জীবাণু মুক্ত করার কাজে, সাধারণ অবস্থায় যেসব ওষুধ জলে দ্রবীভূত হতে পারে না তাদের দ্রবীভূত করার কাজে, বস্ত্রাদি ধৌত করে ময়লা অপসারণের কাজে, গভীর সমুদ্রে ডুবোজাহাজ ও পাহাড় পর্বত ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়ে, সঙ্কর ধাতু তৈরী করার কাজে এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

* বায়ুতে, জলে এবং কঠিনে শব্দের গতিবেগ কি সমান ?

না। বায়ুতে 0° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এবং ৭৬০ মিলিমিটার চাপে শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১১২০ ফুট। জলে শব্দের গতি-বেগ বায়ুর গতিবেগের প্রায় ৫ গুণ এবং কঠিনের ভেতর ১৫ গুণের মত।

* দূরাগত রেলগাড়ীর শব্দ কানে আসে না কিন্তু লাইনে কান পাতলে শোনা যায় কেন ?

লাইন বাস্তব মাধ্যমের কাজ করে এবং বায়ু অপেক্ষা লোহার ভেতর দিয়ে শব্দ দ্রুত সঞ্চারিত হতে পারে।

* মেঘের গুরু গুরু শব্দ শোনা যায় কেন ?

মেঘ গর্জনের মূল শব্দ বিভিন্ন স্তরের মেঘে প্রতিফলিত হয় বলে গুরু গুরু আওয়াজ হয়।

* দূরের ক্ষীণ শব্দ শোনার জন্য কানের কাছে হাতের চেটোকে অবতল করে ধরা হয় কেন ?

হাতের চেটোতে শব্দ প্রতিফলিত হয়ে কানে প্রবেশ করতে পারে।

* আকাশে বিদ্যুৎ চমকের অনেক পরে, বজ্রনাদ শোনা যায় কেন ?

আলোকতরঙ্গের গতিবেগ সেকেণ্ডে যেখানে ১৮৬০০০ মাইল সেখানে শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে মাত্র ১১২০ ফুট। তাই বিদ্যুতের আলো দেখার অনেক পরে শব্দ শোনা যায়।

* সূর্যে সব সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হচ্ছে কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি না কেন ?

শব্দের বিস্তারের জন্য বাস্তব মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। বায়ু অবশ্য একটি মাধ্যম। কিন্তু সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুর স্তর নেই। পৃথিবীর উপরিভাগে মাত্র কয়েকশ মাইল পর্যন্ত বায়ুস্তর বিদ্যমান। তার পরেই বায়ুবিহীন। অতএব সূর্য থেকে বিস্ফোরণের শব্দ আসা সম্ভব নয়।

ডপলার তত্ত্বটি কি ?

শব্দতরঙ্গের তীব্রতা নির্ভর করে তরঙ্গের কম্পন সংখ্যার উপর। কম্পন সংখ্যা যত বেশী হয় ততই শব্দ তীব্র হয়। তাছাড়া তরঙ্গ বিকিরণকারী কোন উৎস এবং শ্রোতার মধ্যে যদি কোন আপেক্ষিক বেগ থাকে তাহলে উৎস যত নিকটবর্তী হয় ততই বিকিরিত তরঙ্গের সংখ্যা বেড়ে যায় বলে শব্দ জোরালো হয়। আবার উৎস শ্রোতার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকলে কম্পনসংখ্যা হ্রাস পায় এবং শব্দের তীব্রতাও হ্রাস পায়। এই তত্ত্বটি ডপলার তত্ত্ব নামে খ্যাত।

উদাহরণ স্বরূপ যখন দূর থেকে কোন রেলগাড়ী বাঁশী দিয়ে আসতে থাকে তখন লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোক শুনতে পায়, বাঁশী ধীরে ধীরে জোরালো হয়ে উঠছে।

রেলগাড়ী লোকটিকে অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই জোরাল ধ্বনি একেবারে নেমে যায় এবং যতই দূরে সরে যায় ততই আওয়াজ ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে।

* ডপলার তত্ত্বের প্রধান প্রধান ব্যবহারিক প্রয়োগগুলি কি কি ?

১। সমুদ্রের নিম্নভাগে চালিত সাবমেরিনের অনুসন্ধানের কাজে যে শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করা হয় তার কম্পাঙ্ক এবং গতিশীল সাবমেরিনে প্রতিফলিত তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ডপলার ক্রিয়ার ফলে পৃথক হয় বলে সাবমেরিনের বেগ ও গতিমুখ নির্ণয় করা হয়।

২। রেডার থেকে যে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গগুচ্ছ প্রেরণ করা হয় সেগুলি গতিশীল বিমান কিংবা কৃত্রিম উপগ্রহে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসায় কম্পাঙ্কের পরিবর্তন ঘটে বলে ওদের উপস্থিতি ও গতিবেগ পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

৩। গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদির গতিবেগ পরিমাপের ক্ষেত্রেও ডপলার-তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়।

* শব্দ সংরক্ষণের মূল নীতি কি?

শব্দ মাত্রই বায়ুর মধ্যে তরঙ্গ ছাড়া কিছুই নয়। কোন গায়কের কণ্ঠনালী অথবা কোন বাদ্যযন্ত্র যেভাবে কম্পিত হয় এবং কম্পিত হওয়ার ফলে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় ঠিক সেইভাবে গায়কের কণ্ঠনালী অথবা বাদ্যযন্ত্রের প্রভাবে অন্য কোন বস্তুকে কম্পিত করতে পারলে শব্দকে নকল করা যায়। ঐ নকল শব্দকে তথা ধ্বনিলিপিকে রেকর্ডে সংরক্ষিত করা হয়।

রেকর্ড প্লেয়ারের ডিস্‌ক্ রেকর্ড, টেপ রেকর্ডারের টেপ বা চৌম্বক ফিতা ইত্যাদিতে শব্দ সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

* সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে মূল তারের সঙ্গে সহযোগী অন্যান্য তার রাখা হয় কেন?

মূল তার থেকে বিশেষ কম্পাঙ্ক যখন ধ্বনিত হয় তখন তার সহযোগী তারগুলিতে সমবেদী কম্পন হয় এবং বাজতে থাকে। এতে শব্দের তীব্রতা ও মাধুর্য বৃদ্ধি পায়।

* কাঠের সেতু পার হওয়ার সময় সৈন্যদের মার্চ করে বা সমতালে পা মিলিয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয় না কেন?

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, সেতু বা অন্যান্য স্থাপত্যের একাধিক স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক থাকতে পারে। এদের নির্মাণের সময় অবশ্য বায়ু-প্রবাহ বা অন্যকিছুর প্রভাবে অনুনাদী কম্পন যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য করা হয়। কেননা অনুনাদ ঘটলে কম্পনের বিস্তার অত্যধিক হবে এবং সেতু ভেঙ্গে পড়বে।

সৈন্যেরা সেতুর উপর দিয়ে মার্চ করতে করতে এগিয়ে গেলে যে পরবশ কম্পনের সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে সেতু দুলতে শুরু করে। সেতুর নিজস্ব কম্পাঙ্কের সঙ্গে সৈন্যদের তালে তালে পা ফেলায় সবার একসঙ্গে পদক্ষেপের সংখ্যা যদি সমান হয় তাহলে উভয়ে মিলে অনুনাদের সৃষ্টি করবে। এর প্রভাবে সেতু দুলতে থাকবে এবং এক-সময় ভেঙ্গেও পড়তে পারে।

* রাইফেলের গুলি ও শব্দ কোনটি আগে এসে পৌঁছায় ?

রাইফেলের গুলির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৯০০ মিটার কিন্তু শব্দের বেগ মাত্র ৩৪০ মিটার প্রতি সেকেণ্ডে। উক্ত কারণে শব্দ শোনার আগেই রাইফেলের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়।

* রাত্রিকালে দূরের শব্দ দিবাভাগ অপেক্ষা স্পষ্ট শোনা যায় কেন ?

বায়ুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে শব্দের বেগ হ্রাস পায়। দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু ঠাণ্ডা ও ভারী থাকে কিন্তু উপরের হাওয়া থাকে অপেক্ষাকৃত গরম ও হালকা। তাই পৃথিবীপৃষ্ঠ অপেক্ষা উপরের দিকের বায়ুতে শব্দের বেগ বেশী। এর ফলে রাত্রিতে কোন উৎস থেকে নির্গত শব্দ-তরঙ্গ উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকেই বেঁকে আসে এবং দূর থেকেও স্পষ্ট শোনা যায়।



* চলচ্চিত্রের ফিল্মে কীভাবে শব্দ সংরক্ষণ করা হয় এবং কীভাবে ওর পুনরাবৃত্তি ঘটে ?

ফিল্মের পাশে সরু ফিতার মত অংশ বা সাউণ্ড ট্র্যাক (S) থাকে। ঐখানে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি ফেলা হয়। তারপর ওর তীব্রতাকে শব্দগ্রাহী মাইক্রোফোনের বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। উক্ত কারণে ডেভেলপ্ করা ফিল্মে ঐ ট্র্যাক বরাবর ফিল্মের স্বচ্ছতার জন্য

শব্দতরঙ্গের কম্পন অনুযায়ী শব্দ বাড়ে কিংবা কমে।

চিত্র প্রদর্শনের সময় পজিটিভ ফিল্মের ঐ সাউণ্ডট্র্যাকে তীব্র ও সূক্ষ্ম আলোকরশ্মি ফেলা হয়। ফিল্ম যখন চলতে থাকে তখন ওর ভেতর দিয়ে নিষ্ক্রান্ত রশ্মির তীব্রতা সাউণ্ড ট্র্যাকের স্বচ্ছতা অনুযায়ী হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। তখন ঐ নিষ্ক্রান্ত রশ্মিকে ফটো সেলের উপর ফেলা হয় এবং তখনই সৃষ্টি হয় পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ। এবার ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহকে অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে বিবর্ধিত করে স্পীকারে পাঠানো হয় এবং তখনই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটে।



* শব্দ কেমন করে নকল করা হয় ?

শব্দ মাত্রই বায়ুতে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। যে কোন উৎসের কম্পনে যে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, অন্য কোন বস্তুকে ঠিক সেইভাবে কম্পিত করাতে পারলেও উৎসের অনুপস্থিতিতে শব্দের অবিকল নকল পাওয়া যাবে। উক্ত কারণে মূল উৎস থেকে নির্গত শব্দকে মাইক্রোফোনে ফেলা হয়। মাইক্রোফোনের পর্দায় শব্দতরঙ্গ পড়লে পর্দাটি কম্পিত হয় এবং কম্পনে উৎপন্ন হয় পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহ। ঐ প্রবাহই শব্দ-তরঙ্গের চাপকে নকল করে নেয়। গ্রামোফোনের ডিসক রেকর্ড ঐ নীতি অবলম্বন করে তৈরি করা হয়ে থাকে। প্লাস্টিকের আবরণযুক্ত একটি ধাতব চাকতির উপর সূচ বসানো থাকে। ঐ সূচকে চালিত করা হয় মাইক্রোফোন ও অ্যামপ্লিফায়ার থেকে উৎপন্ন পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা। চাকতিটিকে নির্দিষ্ট কৌণিক বেগে ঘোরাতে থাকলে

পরির্বতী তড়িৎপ্রবাহের প্রভাবে সূচটি কম্পিত হয় এবং চাকতির উপর ঢেউ খেলানো দাগের সৃষ্টি করে। ঐ দাগই শব্দতরঙ্গের নকল।

এরপর তড়িৎরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঐ চাকতির নেগেটিভ নেওয়া হয়। কোন প্লাস্টিকের চাকতির উপর নেগেটিভ চাকতিকে চাপ দিয়ে যত খুশি রেকর্ড তৈরি করা যায়। শব্দ পুনরুদ্ধার করতে রেকর্ডকে ঘোরাতে হয় এবং ব্যবহার করা হয় পূর্বের কত সূচ। এতে যে কম্পন সৃষ্টি হয় (মূল শব্দতরঙ্গের যে কম্পন ছিল তারই অনুরূপ) তা পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত হয়ে এবং অ্যাম্‌প্লিফায়ারের সাহায্যে বিবর্ধিত হয়ে স্পীকারের পর্দাকে কাঁপাতে থাকলে শব্দের নকল পাওয়া যায়।

আলোক

* আলোককে কি আমরা দেখতে পাই?

না। আলোক বস্তুকে দৃশ্যমান করে। আলোক যখন কোন বস্তু থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে তখন আমরা বস্তুটিকে দেখি। এক কথায় আলোক নিজে অদৃশ্য। আমরা যা দেখি তা আলোকিত বস্তু। অন্যান্য শক্তির মত আলোকও একপ্রকার শক্তি।

* যে বস্তু নিজে থেকে আলোক বিকিরণ করে, তাকে কি বলে?

সপ্রভ আলোক উৎস।

* আলোক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিভাবে বিস্তার লাভ করে?

আলোক তরঙ্গাকারে গমন করে। কিন্তু আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম বলে সরলরেখায় চলে ধরে নেওয়া হয়।

* আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

৮×১০^{-৫} সেন্টিমিটার থেকে ৪×১০^{-৫} সেন্টিমিটার পর্যন্ত।

* আলোর গতিবেগ কত?

শূন্য মাধ্যমে বা বায়ু মাধ্যমে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল।

* কোন্ কোন্ মাধ্যমে আলোক চলাচল করতে পারে এবং কোন মাধ্যমে আলোকের গতিবেগ বেশী ?

বায়ু, স্বচ্ছ তরল ও কাচের ভেতর দিয়ে আলোক চলাচল করতে পারে। বায়ু এদের মধ্যে সবচেয়ে লঘুতর বলে বায়ু মাধ্যমে আলোর গতিবেগ সবচেয়ে বেশী।

* আলোকশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক উৎস কি ?

সূর্য।

* স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ ও ঈষদচ্ছ মাধ্যম কাদের বলা হয় ?

বায়ু, কাচ, জল প্রভৃতি যেসব মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আলোক-সরাসরি চলাচল করতে পারে তাদের বলা হয় স্বচ্ছ মাধ্যম। লোহা, পাথর ইত্যাদির ভেতর দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে না বলে এরা অস্বচ্ছ মাধ্যম। কিন্তু এমন কতকগুলি মাধ্যম আছে, যাদের ভেতর দিয়ে আলোক আংশিকভাবে চলাচল করে। যেমন, ঘষা কাচ, তৈলাক্ত কাগজ ইত্যাদি। উক্ত কারণে পরবর্তীদের বলা হয় ঈষদচ্ছ মাধ্যম।

* কাচ, জল, গ্লিসারিন ও বায়ুর মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ মাধ্যম ?

—বায়ু মাধ্যম।

* ছায়া কেমন করে গঠিত হয় ?

কোন অস্বচ্ছ বস্তুকে আলোকপ্রভবের সামনে ধরলে আলোক-রশ্মি অস্বচ্ছ বস্তু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বস্তুটির পশ্চাতে অন্ধকার দৃষ্ট হয়। পেছনে যদি একটা পর্দা টাঙানো যায় তাহলে দেখা যাবে, বস্তুটির আকার অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানের সৃষ্টি হয়েছে, ঐ অন্ধকার জায়গাকেই ছায়া বলা হয়। বলা বাহুল্য, আলোক সরলরেখায় চলে বলেই ছায়ার উৎপত্তি হয়।

* দুপুরে গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি তলায় গোল গোল আলোর চাকতি গঠন করে কেন ?

আসলে আলোকপ্রভব থেকে আলো যখন খুব ছোট ছিদ্রপথে এসে প্রতিবিম্ব গঠন করে তখন প্রতিবিম্বটি আলোকপ্রভবের প্রতিকৃতি লাভ করে। গাছের পাতা অস্বচ্ছ বস্তু। ঘন পাতার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি মাটিতে পড়লে সূর্যের প্রতিকৃতি পায়। ছিদ্রের আকৃতির উপরে নির্ভর করে না। ছিদ্র ত্রিভুজাকার কিংবা বর্গাকার হলেও গোলাকার আলো পাওয়া যাবে।

* সূচীছিদ্র ক্যামেরা কি ?

আয়তাকার একটি বদ্ধ বাক্সের সম্মুখতলে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। ভেতরে ছিদ্রের সোজাসুজি দেওয়ালে থাকে একটি ঘষা কাচের পর্দা। ছিদ্রের সম্মুখে একটি জলন্ত মোমবাতি ধরলে পর্দায় উল্টো প্রতিবিম্ব পরে। অবশ্য আলোক প্রতিফলন রোধ করার জন্য ভেতরের দেওয়ালগুলিকে কালো করে দেওয়া হয়।

আলোক যে সরলরেখায় চলে, ঐ ক্যামেরাই তার প্রমাণ। ঘষা কাচের পর্দায় বদলে ফটোগ্রাফিক প্লেট রাখলে বস্তুর উল্টো ছবিও পাওয়া যাবে। তবে ছিদ্র যদি বড় হয় তাহলে প্রতিকৃতি অস্পষ্ট হবে। কারণ, একটি বড় ছিদ্র অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের সমষ্টি। তাই ছিদ্র যত ছোট হবে ততই প্রতিকৃতি স্পষ্ট হবে।

* প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া কাদের বলা হয় ?

আলোকপ্রভব ও অস্বচ্ছ বস্তুর আকারের উপরে ছায়া নির্ভর করে। আলোক প্রভব এবং অস্বচ্ছ বস্তু উভয়ে যদি বিস্তৃত হয় তাহলে অস্বচ্ছ বস্তুর সামনে আলোকপ্রভব ও পেছনে পর্দা ধরলে পর্দার মাঝখানে দু-ধরনের ছায়া পড়ে। ভেতরে বৃত্তাকার বেশ গাঢ় কালো ছায়া এবং গাঢ় অংশটাকে ঘিরে চারদিকে বলয়ের মত অপেক্ষাকৃত পাতলা ছায়া। গাঢ় কালো ছায়াটা প্রচ্ছায়া এবং পাতলা ছায়াটা উপচ্ছায়া। আলোকপ্রভবের কোন অংশ থেকে রশ্মি এসে পড়তে পারে না বলে প্রচ্ছায়া গাঢ় এবং আলোকপ্রভবের কোন কোন অংশ থেকে অল্প স্বল্প আলোকরশ্মি আসে বলে উপচ্ছায়া পাতলা।

* আলোকপ্রভব যদি বিস্তৃত হয় এবং অস্বচ্ছ বস্তু যদি ছোট হয় তাহলে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার গঠন কেমন হবে?

পর্দায় প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া উভয়ই গঠিত হবে। তবে অস্বচ্ছ বস্তু থেকে পর্দার দূরত্ব যদি ক্রমান্বয়ে বাড়ানো যায় তাহলে উপচ্ছায়ার ব্যাস বাড়তে থাকবে কিন্তু প্রচ্ছায়ার ব্যাস কমতে থাকবে। অবশেষে পর্দায় প্রচ্ছায়ার চিহ্নমাত্র থাকবে না।

* পাখীরা যখন নিচু দিয়ে উড়ে যায় তখন তাদের ছায়া মাটিতে পড়ে কিন্তু উপরে উড়তে থাকলে ছায়া মাটিতে পড়ে না কেন?

পাখীদের দ্বারা সৃষ্ট প্রচ্ছায়া মাটিতে পড়লেই ছায়া দেখা যায়। সূর্য যেহেতু বিস্তৃত আলোকপ্রভব এবং পাখীর ডানা ক্ষুদ্র অস্বচ্ছ বস্তু। দূরত্ব বাড়লে প্রচ্ছায়া সঙ্কুচিত হতে হতে মাটি থেকে উপরেই বিলীন হয়ে যায়। ফলে আর দেখা যায় না পাখীর ছায়াকে।

* সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কেমন করে হয়?

সূর্য বিস্তৃত আলোকপ্রভব এবং পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়ে অস্বচ্ছ বস্তু। আমরা জানি, সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে এবং পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে চন্দ্র। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে কোন অমাবস্যা তিথিতে যদি সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চন্দ্র আসে এবং তারা যদি একই সরলরেখায় অবস্থান করে তাহলে চাঁদের দ্বারা গঠিত প্রচ্ছায়া শঙ্কু পৃথিবীর কিছু অংশকে আবৃত করে এবং সেই অংশের লোক সূর্যগ্রহণ দেখে। অপরদিকে কোন পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে যদি পৃথিবী আসে এবং এক সরলরেখায় ওরা অবস্থান করে তাহলে পৃথিবীকর্তৃক সৃষ্ট প্রচ্ছায়ায় চন্দ্র সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ঢাকা পড়ে। তখনই হয় চন্দ্রগ্রহণ। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে কেবল অমাবস্যায় চন্দ্র আসে বলে অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় এবং কেবলমাত্র পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবী আসে বলে পূর্ণিমায় হয় চন্দ্রগ্রহণ। সূর্য বিস্তৃত আলোকপ্রভব এবং চন্দ্র ক্ষুদ্র অস্বচ্ছ বস্তু বলে চন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট প্রচ্ছায়ায় পৃথিবীর খুব বেশী অংশ ঢাকা পড়ে না। অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান জুড়ে মানুষ দেখতে পায় না।

* সব পূর্ণিমায় এবং সব অমাবস্যায় গ্রহণ হয় না কেন ?

সূর্যের চারদিকে যে কক্ষপথে পৃথিবী ঘুরছে এবং পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র যে কক্ষে ঘুরছে, এই দুই কক্ষপথ এক সমতলে নেই। দুই কক্ষতলের মধ্যে ৫° কোণ বিদ্যমান। উক্ত কারণে প্রতি অমাবস্যায় ও প্রতি পূর্ণিমায় তিনজনে এক সরলরেখায় আসতে পারে না।

* সূর্যগ্রহণের সময় খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকাতে নেই কেন ?

সূর্যের আলো যে অংশ থেকে বিকিরিত হয় তাকে বলা হয় আলোকমণ্ডল। ঐ আলোকমণ্ডলের উপরে আরও দুটি স্তর আছে। স্তর দুটি যথাক্রমে বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল। এই দুটির কোনটিকে দেখা যায় না অথচ সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলি তিন স্তর তথা আলোকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে।

স্বাভাবিকভাবে আমরা সূর্যের তীব্র আলোকরশ্মির জন্য তাকাতে পারি না এবং তাকাই নাও। কিন্তু সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের আলোকমণ্ডল চন্দ্রের দ্বারা আবৃত হওয়ায় তাকাতে কোন অসুবিধা হয় না। মনে রাখতে হবে, আলোকমণ্ডলটা ঢাকা পড়লেও অপর দুটি স্তর বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল অনাবৃতই আছে এবং সেখান থেকেও ছুটে আসছে ক্ষতিকর রশ্মি। এগুলি চোখে লাগলে চোখের স্থায়ী ক্ষতির সম্ভবনা। তাই গ্রহণকালেও খালি চোখে কখনোই সূর্যের দিকে তাকাতে নেই।

* আলোকের প্রতিফলন কেমন করে হয় ?

আলোকরশ্মি যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আপতিত হয় তখন আলোকরশ্মির কিছু অংশ দ্বিতীয় মাধ্যম তথা প্রতিফলকের তল থেকে পুনরায় প্রথম মাধ্যমের দিকে ফিরে আসে। আলোকরশ্মির উক্ত বৈশিষ্ট্যকে অলোকের প্রতিফলন বলা হয়।

* নিয়মিত প্রতিফলন ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন কি ?

প্রতিফলকের তল যদি মসৃন হয় তাহলে তাতে যে রশ্মিগুলি

আপতিত হয় সেগুলি একটি নির্দিষ্ট দিকে এবং নিয়মানুযায়ী প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রতিফলকের তল যদি অমসৃন হয় তাহলে প্রতিফলনের পর রশ্মিগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম প্রকার প্রতিফলনকে নিয়মিত প্রতিফলন এবং দ্বিতীয় প্রকার প্রতিফলনকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন বলা হয়।

* সিনেমার পর্দা অমসৃন করা হয় কেন ?

অমসৃন হওয়ার জন্য বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটে। তাই সিনেমা হলের ভেতরে যে কোন জায়গায় ভালভাবে দেখা যায়।

* দর্পনের পেছনে প্রলেপ দেওয়া থাকে কেন ?

কাচ স্বচ্ছ মাধ্যম। এর ভেতর দিয়ে আলোকরশ্মি সরাসরি চলে যেতে পারে। তাই বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করার জন্য পেছনে প্রলেপ দেওয়া থাকে।

* দর্পনের পেছনে কিসের প্রলেপ থাকে ?

প্রথমে দেওয়া থাকে রূপোর প্রলেপ। রূপো মূল্যবান তাই পরিমাণে থাকে খুবই কম এবং রূপোর যাতে ক্ষতি না হতে পারে সেজন্য তার উপরে আবার পারদ সালফাইডের প্রলেপ দেওয়া হয়। পারদের সালফাইডের জন্যই প্রলেপ লাল।

* একজন মানুষের পূর্ণ প্রতিবিম্ব দর্পনে দেখতে হলে দর্পনের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে কত হওয়া উচিত ?

নিজ দৈর্ঘ্যের অর্ধাংশ।

* আয়নায় ডান হাতকে বাম হাত দেখায় কেন ?

আয়নায় আসলে প্রতিবিম্বটাই গঠিত হয় এবং প্রতিফলনের ফলে প্রতিবিম্বের পার্শ্বপরিবর্তন ঘটে। তাই প্রতিফলনের ফলেই বাম হাতকে ডান হাত এবং ডান হাতকে বাম হাত দেখায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আয়না থেকে আমরা যতদূরে দাঁড়িয়ে থাকি প্রতিবিম্বটা আয়না থেকে ঠিক তত দূরে মনে হয়।

* আলোকের প্রতিসরণ কাকে বলে ?

যখন আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন সাধারণভাবে তার দিক পরিবর্তন ঘটে। আলোকরশ্মির উক্ত নিয়মকে বলে প্রতিসরণ।

দেখা গেছে, আলোকরশ্মি যখন লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের (প্রতিফলকে যে বিন্দুতে রশ্মি আপতিত হয় সেই বিন্দু বরাবর লম্ব টানলে লম্বটিকে বলা হবে অভিলম্ব) দিকে বেঁকে আসে। এই অবস্থায় আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা বড় হয়। কিন্তু যদি আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় এবং আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা ছোট হয়।

* আলোকরশ্মি বায়ু থেকে জলে প্রবেশ করলে এবং জল থেকে বায়ুতে প্রবেশ করলে আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণের সম্পর্ক কেমন হবে ?

বায়ু লঘু মাধ্যম এবং জল তার চেয়ে ঘন মাধ্যম। তাই আলোকরশ্মির বায়ু থেকে জলে প্রতিসরণ ঘটলে আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা বড় হবে। কিন্তু জল থেকে বায়ুতে প্রতিসরণ ঘটলে আপতন কোণ অপেক্ষা প্রতিসরণ কোণ বড় হবে।

* স্নেলের সূত্রটি কি ?

যে কোন দুটি মাধ্যমের ক্ষেত্রে এবং একই বর্ণের অথবা একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকের ক্ষেত্রে আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইন, এই উভয়ের অনুপাত সর্বদাই ধ্রুবক। অর্থাৎ যদি আপতন কোণকে $\sin i$ এবং প্রতিসরণ কোণকে $\sin r$ দিয়ে সূচিত করা যায় তাহলে $\frac{\sin i}{\sin r}$ = ধ্রুবক হবে। উক্ত ধ্রুবককে μ (মিউ) দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক ধরা হয়।

* কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক ১.৫ বললে কি বোঝায় ?

বায়ু মাধ্যম থেকে কাচের মাধ্যমে প্রতিসৃত হতে হলে যে আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণ উৎপন্ন হয় তাদের সাইনের (Sine) অনুপাত ১·৫।

* দূর থেকে জ্বলন্ত উনানের শিখা অথবা অপর কোন অগ্নিশিখার উপর দিয়ে কোন বস্তুকে দেখলে বস্তুটি কাঁপছে মনে হয় কেন?

অগ্নিশিখার উপরিস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হওয়ায় ঘনত্ব কমে যায় এবং উক্ত কারণে বায়ুর প্রতিসরাঙ্কেরও পরিবর্তন হতে থাকে। তাই বস্তুকে কাঁপতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে ধূ-ধূ প্রান্তরের দিকে তাকালেও বাঁধ গাছপালা ইত্যাদিকেও কাঁপতে দেখা যায়। তার কারণও পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ু অধিক উত্তপ্ত হওয়ায় প্রতিসরাঙ্কের পরিবর্তন ঘটে।

* নক্ষত্ররা ঝিকমিক করে কেন?

নক্ষত্ররা অতিদূরে অবস্থান করছে। নক্ষত্রপৃষ্ঠ থেকে আলোক রশ্মি পৃথিবীপৃষ্ঠে যখন আসে তখন পৃথিবীর উপরিভাগের বিভিন্ন ঘনত্বের বায়ুস্তরকে অতিক্রম করে আসতে হয়। তার ফলে প্রতিসরাঙ্কের পরিবর্তন ঘটে। অপরপক্ষে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা ও জলকণার দ্বারা নক্ষত্রের আলোকের কিছু অংশ চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। এইসব কারণের জন্য নক্ষত্রের আলোককে সবসময় কম বেশী বলে মনে হয় এবং ঝিকমিক করতে থাকে।

* গ্রহদের আলো স্থির কেন?

নক্ষত্রদের তুলনায় গ্রহদের অবস্থান পৃথিবীর অত্যন্ত কাছে। গ্রহদের যদিও নিজস্ব আলোক নেই তথাপি সূর্য থেকে সে পর্যাপ্ত আলো লাভ করে আলোকিত হয়। নিকটে অবস্থান করার জন্য নক্ষত্রের চেয়ে অনেক বেশী আলো আমরা লাভ করে থাকি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের পার্থক্য এবং ধূলিকণা ইত্যাদির দ্বারা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন সত্ত্বেও নক্ষত্র অপেক্ষা অনেক বেশী আলো পৃথিবীপৃষ্ঠে আসে। তাই নক্ষত্রদের মত গ্রহরা ঝিকমিক করে না। অর্থাৎ তাদের আলো স্থির।

* বালতিকে জলপূর্ণ করলে বালতির গভীরতা অনেক কম মনে হয় কেন ?

জল স্বচ্ছ তরল পদার্থ অথচ বায়ু অপেক্ষা ঘনতর। এখানে বালতির তলদেশটা আমাদের লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু লক্ষ্যবস্তুটি ঘনতর মাধ্যমে থাকায় সেখান থেকে নির্গত আলোকরশ্মি জলের বিভেদ তলে প্রতিসৃত হওয়ার পর যখন বেঁকে আমাদের চোখে পড়ে তখন প্রতিসৃত রশ্মিগুলি একটু উপরে অন্য কোন জায়গা থেকে আসছে মনে হয়। এটিকে তার প্রতিবিম্ব বলা হবে এবং আপাত গভীরতা প্রকৃত গভীরতা থেকে কম মনে হবে।

* একটা লাঠির কিছু অংশ জলে ডুবিয়ে রাখলে জলে নিমজ্জিত প্রান্তকে বাঁকা মনে হয় কেন ?

বায়ু অপেক্ষা জল ঘনতর মাধ্যম। চোখ আছে লঘুতর মাধ্যমে এবং লাঠির নিমজ্জিত অংশ আছে ঘনতর মাধ্যমে। জলের বিভেদ তলে প্রতিসরণের ফলে লাঠির নিমজ্জিত অংশের প্রতিটি বিন্দু যে প্রতিবিম্ব গঠন করে তা প্রকৃত গভীরতা থেকে একটু উপরে। তাই প্রতিবিম্ব এবং মূল লাঠি একই সরলরেখায় মনে না হয়ে বেঁকে আছে মনে হয়।

* জলে কাচখণ্ড ডুবে থাকলে দেখা যায় কিন্তু গ্লিসারিনে দেখা যায় না কেন ?

দুটি স্বচ্ছ মাধ্যমের বিভেদ তলে আপতিত আলোক কেবলমাত্র প্রতিসৃত হয় না কিছুটা প্রতিফলিতও হয়। অথচ দুটি মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক যদি সমান অথবা প্রায় সমান হয় তাহলে বিভেদতল থেকে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হতে পারে না অথবা অল্প কম বেশী হলে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি এত দুর্বল হয় যে সহজে চোখে ধরা পড়ে না। এক্ষেত্রে গ্লিসারিনের প্রতিসরাঙ্ক ১·৪৭ এবং কাচের প্রতিসরাঙ্ক ১·৫১। তাই উভয়ের প্রায় সমান প্রতিসরাঙ্ক হওয়ার জন্য গ্লিসারিনে নিমজ্জিত কাচখণ্ডকে দেখা যায় না।

* সঙ্কট কোণ কি?

যদি কোন অলোকরশ্মি ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় প্রতিসরণ কোণ ৯০°র সমান হয় অর্থাৎ দুই বিভেদতল ঘেঁষে বরাবর অগ্রসর হয় তাহলে ঐ রশ্মির আপতন কোণকে মাধ্যমদ্বয়ের সঙ্কট কোণ বলা হয়।

* আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন কাকে বলে?

ঘনতর মাধ্যম থেকে কোন আলোকরশ্মি যদি লঘুতর মাধ্যমে আপতিত হয় এবং আপতন কোণটি যদি সঙ্কট কোণ অপেক্ষাও বড় হয় তাহলে রশ্মিটি প্রতিফলিত হয়ে ঘনতর মাধ্যমেই ফিরে আসে এবং তার কোন অংশই প্রতিসৃত হয়ে লঘুতর মাধ্যমে সঞ্চারিত হতে পারে না। অনুরূপ প্রতিফলন ঘটলেই বলা হয় আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন।

* মরীচিকা কি?

মরুভূমিতে আলোকের আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য পথিকের যে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে তাকেই বলা হয় মরীচিকা।

সূর্যের উত্তাপে মরুভূমির বালুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং তৎসংলগ্ন বায়ুও উত্তপ্ত হয়, ফলে ঘনত্ব কমে যায়। কিন্তু উপরের দিকে বায়ুস্তর ততটা উত্তপ্ত হতে পারে না। তাই উপরের দিকে বায়ুস্তরের তাপমাত্রা ক্রমশ কম এবং উক্ত কারণে ঘনত্বও ক্রমান্বয়ে বেশী।

দূরে অবস্থিত কোন গাছপালা থেকে আলোকরশ্মি উপরের শীতল বায়ুস্তর তথা ঘনতর মাধ্যম থেকে যখন উত্তপ্ত বায়ুস্তর তথা লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন প্রতিসৃত হয়ে অভিলম্ব থেকে দূরে বেঁকে যায়। তারপর স্তরগুলিকে পরপর অতিক্রম করতে করতে ক্রমশ বাঁকতে থাকে এবং এমন এক পর্যায়ে আসে যখন আপতন কোণ সেই স্তর এবং পরবর্তী স্তরের সঙ্কট কোণ অপেক্ষা বেশী হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় আলোকরশ্মির আর প্রতিসরণ না হয়ে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে এবং প্রতিফলিত রশ্মি উপরের দিকে যাত্রা শুরু করে।

এইভাবে আলোকরশ্মি লঘুতর স্তর থেকে ঘনতর স্তরে প্রতিসৃত হতে হতে উপরে বাঁকতে থাকবে এবং একসময় পথিকের চোখে পড়বে। তখন পথিক দেখবে তার প্রতিবিম্ব।

অপরদিকে তাপমাত্রার সব সময় পরিবর্তন হয় বলে বায়ুস্তরের ঘনত্ব এবং প্রতিসরাঙ্কেরও পরিবর্তন হয়। তাই প্রতিবিম্বকে পথিক মৃদু মৃদু আন্দোলিত হতে দেখে। যেহেতু গাছপালা থেকে সোজাসুজি আলো আসতে পারছে না, কম্পিত প্রতিবিম্বটাই চোখে পড়ছে তাই জলাশয়ে পতিত গাছপালার প্রতিবিম্ব বলে ভ্রম হয়।

* মেরুদেশে সমুদ্রে দূরবর্তী জাহাজসমূহকে সমুদ্রে না দেখে আকাশে ঝুলে থাকতে দেখা যায় কেন?

এও এক রকমের মরীচিকা। মেরুদেশে অত্যন্ত ঠাণ্ডার জন্য পৃথিবীসংলগ্ন বায়ুস্তরের ঘনত্ব সর্বাধিক এবং উপরের দিকে ঘনত্ব ক্রমশ কম। দূরের জাহাজ থেকে আলোকরশ্মি যখন উর্ধ্বগামী হয় তখন ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশের ফলে অভিলম্ব থেকে দূরে প্রতিসৃত হয়। তারপর আপতন কোণ বৃদ্ধি পেতে পেতে একসময় আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটায় এবং আলোকরশ্মি নিম্নগামী হয়ে মানুষের চোখে ধরা পড়ে। এই অবস্থায় উপরে জাহাজের প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এবং জাহাজ আকাশে ঝুলে আছে মনে হয়।

* ভূষাকালি মাখানো একটি ধাতব বলকে জলে ডোবালে চকচকে দেখায় কেন?

ভূষাকালি মাখানোর ফলে বায়ুর একটা পাতলা স্তর তার চারদিকে থেকে যায়। যার জন্য জলের ভেতরেও বলটিকে জল থেকে একরকম পৃথক করে রাখে। আলোকরশ্মি ঘনতর মাধ্যম জল থেকে লঘুতর মাধ্যম বায়ুতে যখন আসে তখন আপতন কোণ জল ও বায়ুর বিভেদ তলে সঙ্কট কোণ অপেক্ষা বেশী হয় এবং আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। উক্ত কারণে বলটিকে চকচকে দেখায়।

একই কারণে একটি জলপূর্ণ বিকারে তির্যকভাবে রাখা খালি

টেষ্টটিউব বেশ চকচকে দেখায়। কেন না টেষ্টটিউবটির চারপাশে একটা পাতলা বায়ুস্তর থেকে যায়। পদ্মপাতা কিংবা কচুপাতায় জলবিন্দুর চারদিকে বায়ুস্তর থেকে যায় বলে জলবিন্দুকে ঐ আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্যও চকচকে দেখায়।

* পেরিস্কোপের ভেতরের দেওয়াল কালো রঙ করা হয় কেন ?

আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন রোধ করার জন্য।

* লেন্স কি ?

ছুটি গোলীয় তল অথবা একটি গোলীয় এবং একটি সমতল দ্বারা সীমাবদ্ধ কোন স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলা হয়।

* আতশী কাচ (Burning glass) কি ?

আতশী কাচ এক ধরনের লেন্স। এর দ্বারা সূর্যের সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা হয়। ফলে এত তাপ সৃষ্টি হয় যে, সহজদাহ্য বস্তুতে অগ্নিসংযোগ ঘটে।

* ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লেন্সের ব্যবহার কোথায় কোথায় ?

চশমা, ক্যামেরা, অণুবীক্ষণযন্ত্র ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে লেন্স ছাড়া উপায় নেই। বর্তমানে আবার নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিতে এবং সৌরশক্তি সংগ্রহের ক্ষেত্রেও লেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে।

* লেন্স সাধারণত কত প্রকারের ও কি কি ?

লেন্স সাধারণত ছু'রকমের। উত্তল ও অবতল। যেসব লেন্সের মাঝখানটা মোটা এবং প্রান্তের দিকে ক্রমশ পাতলা, তাদের বলা হয় উত্তল লেন্স। আর যেসব লেন্সের মাঝখানটা পাতলা অথচ প্রান্তের দিকে ক্রমশ মোটা তাদেরই বলা হয় অবতল লেন্স।

উত্তল ও অবতল উভয় প্রকার লেন্স আবার তিন রকমের হয়ে থাকে। উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে উভয়তল উত্তল হলে উভোত্তল, এক তল উত্তল ও অন্য তল সমতল হলে সমতলোত্তল এবং এক তল উত্তল ও অপরতল অবতল হলে বলা হয় অবতলোত্তল। তেমনই অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে উভয়তল অবতল হলে উভাবতল, এক তল অবতল

ও অপরতল সমতল হলে সমতলাবতল এবং এক তল অবতল ও অন্য তল উত্তল হলে বলা হয় উত্তলাবতল।

* উত্তল লেন্সকে অভিসারী (Converging) লেন্স ও অবতল লেন্সকে অপসারী (Diverging) লেন্স কেন বলা হয়?

লঘু মাধ্যম থেকে আগত আলোকের সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ উত্তল লেন্স কর্তৃক অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত করে তথা রশ্মিগুলি এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং অবতল লেন্স দ্বারা রশ্মিগুলি অপসারী রশ্মি গুচ্ছে পরিণত হয়। অর্থাৎ রশ্মিগুলি প্রতিসৃত হওয়ার পর মনে হয় যেন একটি বিন্দু থেকে ছড়িয়ে পড়ছে বা অপসৃত হচ্ছে।

* চোখের কোন্ কোন্ ত্রুটিতে কি কি ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয়?

স্বল্পদৃষ্টি তথা শর্ট সাইট বা মাইয়োপিয়ায় অবতল লেন্স, দীর্ঘদৃষ্টি বা হাইপার মেট্রোপিয়ার জন্য উত্তল লেন্স এবং ক্ষীণদৃষ্টি বা চালসে তথা প্রেসবাইওপিয়ার জন্য বাইফোকাল লেন্স ব্যবহার করা হয়। বাইফোকাল লেন্স অর্থে ফ্রেমে বাঁধাই উপরের দিকটায় থাকে অবতল লেন্স এবং নিচের দিকটায় থাকে উত্তল লেন্স।

* লেন্সের ক্ষমতা কাকে বলে?

উত্তল লেন্সের ক্ষমতা বলতে উত্তল লেন্সটি সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে লেন্সের কত কাছে একত্রিত করতে পারে তাকেই বোঝায়। অপরদিকে অবতল লেন্সের ক্ষমতা বলতে বোঝায় অবতল লেন্সটি কতখানি রশ্মিগুচ্ছকে অপসৃত করতে পারে। এই থেকে মনে করা যেতে পারে যে, যে লেন্সের যত বেশী ক্ষমতা তার ফোকাস দূরত্ব তত কম। সাধারণত লেন্সের ১০০ সেমি ফোকাস দূরত্বের ক্ষমতাকে একক ধরা হয়। এককটির নাম ডায়পটার।

* লেন্সের ক্ষেত্রে "+" কিংবা "—" উল্লেখ থাকে কেন?

উত্তল লেন্সের ক্ষমতাকে ধনাত্মক তথা "+" এবং অবতল লেন্সের ক্ষমতা ঋণাত্মক তথা "–" ধরা হয়। তাই "+" এবং "—" কি ধরনের লেন্স সেই নির্দেশই প্রদান করে।

* লেন্স উত্তল কিংবা অবতল সহজে চেনার উপায় কি ?

লেন্সের সম্মুখে নিজেরই হাতের একটা আঙ্গুল ধরলে প্রতিবিম্ব যদি আঙ্গুল অপেক্ষা মোটা দেখায় তাহলে সেটি হবে উত্তল লেন্স এবং প্রতিবিম্ব যদি আঙ্গুল অপেক্ষা সরু মনে হয় তাহলে হবে অবতল লেন্স।

* বিচ্ছুরণ কাকে বলে ?

সাদা আলোর রশ্মিগুচ্ছ প্রিজম বা ত্রিশিরা কাচের ভেতর দিয়ে প্রতিসৃত হলে নানা রঙে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। উক্ত ঘটনাকে বলে বিচ্ছুরণ।

* যৌগিক আলো ও একবর্ণ আলো কাদের বলা হয় ?

যে আলোকরশ্মি প্রিজম দ্বারা বিশ্লিষ্ট হলে একাধিক বর্ণের আলো উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় যৌগিক আলো এবং যে আলোকরশ্মি বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয় না তাকে বলে একবর্ণ আলো।

* বর্ণালী কি ?

সাদা আলোকের বিচ্ছুরণের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট পটিকে বলা হয় বর্ণালী।

* আলোর রঙ কি সাদা ?

না। সাদা আলো বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলদে কমলা ও লাল—এই সাত রঙের সমষ্টি। রঙগুলি তাদের ইংরাজী নামের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত "VIBGYOR" দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বাংলায় হবে "বেনীআসহকলা"। সাদা আলো প্রিজমের দ্বারা বিশ্লিষ্ট হলে পর্দায় এদের পরপর সজ্জিত থাকতে দেখা যায়।

* কোন একক রঙের আলোক প্রিজমের উপর ফেললে বিচ্ছুরণ হয় না কেন ?

একাধিক বর্ণমিশ্রিত আলোর ক্ষেত্রেই বিচ্ছুরণ হয়ে থাকে। একক রঙ বিচ্ছুরণ না ঘটে প্রতিসরণ ঘটে।

* রঙগুলি বেগুনী থেকে পরপর সাজানো কেন ?

বেগুনী রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম এবং লালের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী। তাই সবচেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেগুনী থেকে পরপর উচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক পরপর সজ্জিত থাকে।

* কোন বস্তুর রঙ কিসের উপর নির্ভর করে ?

সূর্যের সাদা আলো সাত রঙের সমষ্টি। সূর্যের আলো যখন কোন বস্তুর উপর পড়ে তখন বস্তুটি সাদা আলোর এক বা একাধিক রঙকে শোষণ করে দেয়। এবং বাকি রঙ বা রঙগুলিকে প্রতিফলিত করে। যে রঙটি বস্তুর দ্বারা প্রতিফলিত হয় বস্তুটিকে সেই রঙের দেখায়।

* গাছের পাতা সবুজ কেন ?

সূর্যের সাদা আলো যখন গাছের পাতার উপর পড়ে তখন পাতা সাত রঙের সব কটিকে শোষণ করে নেয় কিন্তু পারে না ঐ সবুজ রঙটিকে। ঐ সবুজ রঙটিকে প্রতিফলিত করে বলে গাছের পাতা সবুজ।

* লাল জবাফুলকে সবুজ কাচের ভেতর দিয়ে দেখলে কালো দেখায় কেন ?

জবাফুল যেহেতু লাল রঙকে প্রতিফলিত করতে পারে অথচ সবুজ রঙ কেবলমাত্র সবুজ রঙটা প্রতিফলিত করে এবং অন্য সব রঙকে শোষণ করে নেয়। তাই সে ফুলের লাল রঙটিকেও শোষণ করে নেবে। ফলে লাল জবা ফুল কালো দেখাবে।

* কোন বস্তু সাদা এবং কালো দেখায় কেন ?

যে বস্তু সূর্যরশ্মির সব কটি রঙকে প্রতিফলিত করে দেয় অথচ কোন রঙকে শোষণ করতে পারে না তাকে সাদা দেখায়। অপরদিকে যে বস্তু সাত রঙের সব কটি রঙকে শোষণ করে নেয় তাকেই কালো দেখায়।

* সিনেমার পর্দা সাদা কেন ?

সাদা পর্দা কোন রঙকে শোষণ করতে পারে না বলে পর্দায় যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তার ঔজ্জ্বল্য বজায় থাকে।

* প্রাথমিক বর্ণ ও পরিপূরক বর্ণ কাকে বলে ?

লাল, সবুজ ও নীল—এই তিন বর্ণকে যথোপযুক্ত পরিমাণে মেশালে যে কোন বর্ণ সৃষ্টি হতে পারে। তাই এদের বলা হয় প্রাথমিক বর্ণ। কিন্তু এমন কিছু কিছু বর্ণ আছে, যাদের দুটিকে মিশ্রিত করলে সাদা বর্ণের সৃষ্টি হয়। এরা পরিপূরক বর্ণ। যেমন হলদে ও গাঢ় নীলের মিশ্রণ কিংবা কমলা ও নীলের মিশ্রণ সাদা।

* কাচা কাপড়ে নীল দিয়ে শুকিয়ে নিলে আরও সাদা দেখায় কেন ?

বেশী নীল রঙ প্রয়োগ করলে কাপড়কে নীলই দেখাবে। কিন্তু পরিমাণ মত নীল দিলে অধিকতর সাদা দেখায়। যেহেতু ঈষৎ লাল বা কমলা ও নীল, হলদে ও নীল পরিপূরক বর্ণ। তাই এই দুই মিশ্রণে সাদা হয়। সাধারণত কাপড়ের বর্ণ একটু লালচে বলে এই ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ পরিপূরক বর্ণ নীলের প্রয়োগে অধিকতর সাদা দেখায়।

* ভিজে জায়গায় তেল পড়লে সূর্যের আলোতে রঙিন দেখায় কেন ?

যেহেতু সূর্যের সাদা আলো সাত রঙের সংমিশ্রণ। এই অবস্থায় সূর্যের সাদা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে এবং বিচ্ছুরণের ফলে সাতটি বর্ণ পৃথক হয়।

* জলকে বর্ণহীন দেখায় কিন্তু জল জমে বরফ হয়ে পড়লে সাদা দেখায় কেন ?

জল স্বচ্ছ পদার্থ। সূর্যের আলোর সাত-সাতটি বর্ণ স্বচ্ছ জলের ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে। প্রতিফলিত বা শোষিত হতে পারে না। অথবা যতটুকু শোষিত বা প্রতিফলিত হয় তা অতি সামান্যই।

জল জমে যখনই বরফ হয়ে পড়ে তখন সে কিছুটা অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে। যেমন কাচ স্বচ্ছ হলেও কাচকে গুঁড়া করলে স্বচ্ছ বলে মনে হয় না। ফলে অস্বচ্ছ বরফের দ্বারা প্রায় সব বর্ণের আলোই প্রতিফলিত হয়ে যায়। উক্ত কারণে বরফকে সাদা দেখায়।

* বিক্ষেপন কি ?

আলোক তরঙ্গ যখন নিজ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের

কোন বস্তুকণার উপর এসে পড়ে তখন ঐ বস্তুকণা আলোক তরঙ্গ থেকে শক্তি শোষণ করে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। উক্ত ঘটনাকে বিক্ষেপন বলে। দেখা গেছে, যে আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম হয় সে আলো তত বেশী বিক্ষিপ্ত হয়।

* আকাশকে নীল দেখায় কেন ?

সূর্যালোকের সাত রঙের মধ্যে বেগুনী ও নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম। আকাশে সবসময় ভাসমান বস্তুকণাদের দ্বারা কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেগুনী ও নীল আলোই বেশী বিক্ষিপ্ত হয়। অপরদিকে সূর্যালোকে বেগুনী অপেক্ষা নীল আলো থাকে অধিক এবং বেগুনী অপেক্ষা নীলের প্রতি আমাদের চোখ অধিক সংবেদনশীল। তাই বিক্ষিপ্ত নীল আলোটাই আমাদের চোখে পড়ে।

* সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় পুব আকাশ এবং পশ্চিম আকাশকে লাল দেখায় কেন ?

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দিগন্ত থেকে তির্যকভাবে সূর্যরশ্মিকে সুদীর্ঘ বায়ুস্তর অতিক্রম করে আসতে হয়। বায়ুর স্তরগুলিতে অসংখ্য বস্তুকণা, ধূলিকণা ও জলকণা থাকে। ফলে উক্ত অবস্থায় সূর্যরশ্মিকে অধিক ঘন বায়ুস্তর ভেদ করে আসতে হয় বলে প্রথম থেকে বেগুনী, নীল প্রভৃতি কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোগুলি বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। শেষপর্যন্ত বেশী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল আলোই আমাদের চোখে পড়ে।

* সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কি আমরা সূর্যকে দেখতে পাই ?

পৃথিবীর উপরিভাগে শত শত মাইলব্যাপী সুদীর্ঘ বায়ুস্তর বিদ্যমান। এই বায়ুস্তরের ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। মাটি থেকে উপরের দিকে বায়ুস্তর ক্রমান্বয়ে পাতলা। তাই উপরের দিকে ঘনত্বও ক্রমশ কম। সূর্যরশ্মি যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন তাকে বায়ুমণ্ডলের বহু স্তর তথা মাধ্যম ভেদ করে আসতে হচ্ছে। ফলে সূর্যরশ্মির প্রতিসরণ ঘটছে। তাই সূর্যকে আমরা সঠিক জায়গায় দেখি না। যে অবস্থায় দেখি, প্রকৃতপক্ষে তার একটু উপরেই থাকে। অতএব

প্রভাতে সূর্য ওঠার একটু আগেই আমরা সূর্যকে দেখে থাকি। ঐ একই কারণে সূর্য অস্ত গেলেও আমরা অল্পক্ষণ দিগন্তের গায়ে সূর্যকে দেখবো।

* আকাশে রামধনু কেন দেখা যায় ?

সূর্যের বিপরীতে আকাশে মেঘের জলীয় বাষ্প বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার দ্বারা সূর্যালোকের প্রতিসরণ ও আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে সাদা আলো বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশের গায়ে বিভিন্ন বর্ণের বৃত্তচাপগুলি ধনুকের মত পরপর সজ্জিত দেখা যায়। বৃত্তচাপগুলির একেবারে বাহিরে থাকে লাল ও ভেতরে থাকে বেগুনী। মাঝখানে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করে অন্যান্য বর্ণ।

* সূর্যরশ্মি ব্যতীত অন্য আলো থেকে কি বর্ণালী পাওয়া যায় ?

হ্যাঁ। গ্যাসের সাদা আলো, বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট, এমনকি উত্তপ্ত কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ থেকে প্রাপ্ত আলোকে বিশ্লেষণ করলেও বর্ণালী পাওয়া যায়।

* নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী বা কনটিনিউয়াস স্পেক্ট্রা কাকে বলে ?

লাল থেকে বেগুনী—এই সাতটি বর্ণ যদি পরপর নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি উজ্জ্বল পটির আকারে সাজানো থাকে তাহলে তাকে নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী বলা হয়।

* কোন মৌলিক পদার্থকে কিভাবে বর্ণালী বিশ্লেষণের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয় ?

ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের উপস্থিতিতে বর্ণালীতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের রেখা পাওয়া যায়। যেমন একটি বুনসেন দীপের শিখায় খাদ্যলবণ রাখলে লবণের সোডিয়াম থেকে যে বাষ্প নির্গত হয় তাতে দীপের শিখা স্বর্ণাভ হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। এবার এর বর্ণালীকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, সাদা আলোর বর্ণালীতে যেখানে হলুদ পটি থাকবার কথা সেখানে দুটি হলুদ বর্ণের উজ্জ্বল রেখা উৎপন্ন হয়েছে। অথচ সোডিয়ামের উপস্থিতি ছাড়া উক্ত অংশে অন্য কোন মৌল এই

ধরনের রেখা উৎপন্ন করতে পারে না। অনুরূপভাবে লিথিয়ামের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে উজ্জ্বল লাল রেখা ইত্যাদি।

অজ্ঞাত কোন মৌলকে সনাক্ত করতে হলে তাকে প্রথমে গ্যাস দীপের সাহায্যে উদ্দীপিত করতে হয়। তাছাড়া অতি তপ্ত ও ভাস্বর অবস্থায় তার থেকে নির্গত আলোককে নিয়েও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

* শোষক বর্ণালী কাকে বলে ?

অতি তপ্ত ও ভাস্বর কোন বস্তু থেকে নির্গত সাদা আলোক যদি শীতল বাষ্পের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে এবং ঐ বাষ্প যদি পারমাণবিক অবস্থায় থাকে তাহলে উক্ত গ্যাস উত্তপ্ত হলে যে বর্ণের আলোক বিকীর্ণ করতো ঠিক সেই বর্ণের আলোককে সাদা আলো থেকে শোষণ করে নেয়। ফলে বস্তু থেকে নির্গত সাদা আলোকের বর্ণালী পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, লাল থেকে বেগুনী পর্যন্ত বর্ণগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে না। যেখানে যে বর্ণের আলো শোষিত হয়েছে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে কালো কালো রেখা। এই কালো রেখাযুক্ত বর্ণালীকে বলা হয় শোষক বর্ণালী।

* ফ্রন হোপার রেখা কি ?

সূর্যের সাদা আলোককে সাধারণ প্রিজম দ্বারা বিশ্লিষ্ট করলে সাত-বর্ণের নিরবচ্ছিন্ন পটি পাওয়া যায়। কিন্তু উন্নতমানের বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালীকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, বর্ণালীতে রয়েছে অসংখ্য কালো কালো রেখা। এই রেখাগুলি প্রকৃতপক্ষে শোষক বর্ণালী এবং এদের উপস্থিতি প্রথমে লক্ষ্য করেছিলেন বিজ্ঞানী ওলাস্টন। পরে ঐ রেখাগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন বিজ্ঞানী ফ্রন হোপার। তাঁরই নামানুসারে সূর্য বর্ণালীর মধ্যে অবস্থিত কালো কালো রেখাগুলিকে বলা হয় ফ্রন হোপার রেখা।

* রমন লাইনস ও রমন এফেক্ট কী ?

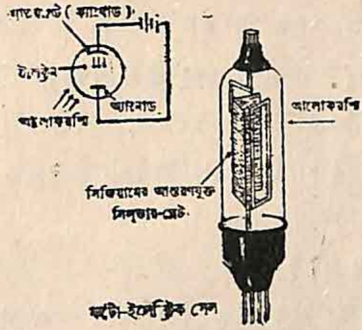
কোনও একটি বিশেষ বর্ণের আলোক (মনোক্রোমেটিক) রশ্মি

তরল অথবা গ্যাসীয় কোন মাধ্যমে যদি পরিচালিত করা হয় তাহলে উক্ত আলোকরশ্মির কিছু অংশ ওর গতিপথের লম্ব বরাবর বিচ্ছুরিত হয়। বিচ্ছুরিত ঐ আলোকের বর্ণালীকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় মূল আলোকরশ্মির বর্ণরেখার পাশে অবস্থান করছে কতকগুলো অনুজ্জ্বল বর্ণরেখা। আবিষ্কর্তা অধ্যাপক সি. ভি. রমনের নামানুসারে বর্ণরেখাগুলির নামকরণ করা হয়েছে রমন লাইনস। মাধ্যমের তরল অথবা গ্যাসীয় অণুগুলোর গায়ে প্রতিহত হওয়ার ফলেই আলোক তরঙ্গের কিছু কিছু অংশ পাশের দিকে বিচ্ছুরিত হওয়ার জন্যই নতুন নতুন বর্ণরেখার উদ্ভব হয়ে থাকে এবং একবর্ণবিশিষ্ট তথা একবর্ণী (মনোক্রোমেটিক) আলোকের ঐ ধর্মকে বলা হয় রমন এফেক্ট। রমন আবিষ্কৃত এই তথ্যটির দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের আণবিক কম্পনশক্তি নির্ধারিত করার সুবিধা হয়েছে।

* ফটো ইলেকট্রিক সেল কেমন করে তৈরি করা হয় এবং কেমন করেই বা তড়িৎ উৎপন্ন হয় ?

ফটো ইলেকট্রিক সেল বিশেষ ধরণের একটি বায়ুশূন্য কাচনল। অথবা কমচাপে অধিকতর কোন সংবেদনশীল গ্যাসও কাচনলে রাখা হয়। অপরাপর বৈদ্যুতিক সেলের মত ওরও ক্যাথড বা ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার এবং অ্যানড বা ধনাত্মক তড়িদ্বার থাকে। ক্যাথডের গায়ে সিজিয়াম অথবা ক্যাডমিয়ামের কোন লবণের একটা আস্তরণ দেওয়া হয়। কারণ, ঐ ধাতুগুলি খুবই আলোকসংবেদী।

যখনই আলোকরশ্মি সেলের উপর পতিত হয় তখনই ক্যাথড থেকে নির্গত হয় ইলেকট্রনের প্রবাহ এবং সেগুলি প্রবাহিত হতে থাকে অ্যানডের দিকে। এর ফলে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ। যতক্ষণ সেলের উপর আলো পড়ে কেবল ততক্ষণই তড়িৎপ্রবাহ চলতে থাকে। আলোকপাত বন্ধ হয়ে গেলেই তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। আলোকরশ্মিকে সরাসরি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তর করার জন্যই ঐ সেল। একে ফটো সেলও বলা হয়। রূপান্তরের এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট।



ফটো-ইলেকট্রিক সেল

* ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক প্রবর্তিত কোয়াণ্টাম তত্ত্বটি কী ?

কোন উত্তপ্ত বস্তু অথবা কোন আলোকশিখা থেকে বিকিরিত তাপশক্তি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকার আকারে তরঙ্গায়িত অবস্থায় শক্তির আধারে বিচ্ছুরণ ঘটে। এই বিচ্ছুরণ আবার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নয়। আলোকরশ্মির শক্তিকণিকাগুলো সর্বক্ষেত্রে আবার সমান হয় না। বিকিরণের তীব্রতা অনুযায়ী ওদের ভর কমবেশী হয়। যেমন লাল আলো থেকে বিচ্ছুরিত শক্তিকণিকাগুলো নীল আলো থেকে বিচ্ছুরিত শক্তিকণিকাসমূহ অপেক্ষা আকারে ও ভরে ক্ষুদ্রতর।

আলোকরশ্মির ঐ শক্তিকণিকাগুলোকেই বলা হয় কোয়াণ্টাম। বিভিন্ন শক্তিকণিকা তথা কোয়াণ্টামের ভর ইত্যাদির নির্ণয় করার গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করে তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন জার্মান-বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। তাই উক্ত তত্ত্বটিকে বলা হয় প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব। প্রতি সেকেণ্ডে বিকিরণের তরঙ্গসংখ্যার উপরেই তথা বিকিরণের ফ্রিকোয়েন্সির উপরেই নির্ভর করে কোয়াণ্টামের আকার ও ভর। কোয়াণ্টাম = ফ্রিকোয়েন্সি × একটি ধ্রুবক। এই ধ্রুবকটিকে বলা হয় প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক।

* ফোটন কাকে বলে ?

আলোকের সমূহ ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আলোকের তরঙ্গ-ধর্ম এবং কণিকা-ধর্ম দুটিই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রে আলোকের তরঙ্গ-ধর্মকে স্বীকার না

করে কণিকাধর্মী বলে মনে করা হয়। এমন অবস্থায় আলোকরশ্মির সংগঠক অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা এবং ঐ কণিকাগুলোকেই ফোটন বলা হয়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ফোটন কণিকাগুলির মধ্যে সামান্য হলেও নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি নিহিত থাকে। এরাও শক্তি-কণিকা বা কোয়ান্টা।

* তড়িৎ চৌম্বকরশ্মি কী ?

নক্ষত্রপৃষ্ঠ থেকে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় ও অন্যান্য কারণে কতকগুলো রশ্মি উৎপন্ন হয় এবং এগুলি তরঙ্গের আকারে মহাবিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেগুলি যথাক্রমে (১) বেতার রশ্মি [তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক মি. মি. থেকে কয়েক হাজার মিটার], (২) অব লোহিত রশ্মি [তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-1} সেমি থেকে 8×10^{-5} সেমি], (৩) আলোকরশ্মি [তরঙ্গদৈর্ঘ্য 8×10^{-5} সেমি থেকে 4×10^{-5} সেমি], (৪) অতিবেগুনী রশ্মি [তরঙ্গদৈর্ঘ্য 4×10^{-5} সেমি থেকে 10^{-6} সেমি] (৫) রঞ্জন রশ্মি [তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-6} সেমি থেকে 10^{-9} সেমি, এবং (৬) গামা রশ্মি [তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-9} সেমি অপেক্ষা কম]।

এরা শক্তি তরঙ্গ। শূন্য মাধ্যমে এদের গতিবেগ ২৯৯৭৯ × ১০^{৮} মিটার প্রতি সেকেণ্ডে বা ১৮৬২৪২ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে।

* লেসার রশ্মি ও মেসার রশ্মি কাদের বলা হয় ?

লেসার [LASER] একটি সংক্ষেপিত নাম। পুরোনাম **Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.** আবিষ্কারক সি. এইচ. টাউনেস।

লেসার হচ্ছে এক ধরণের রশ্মি—যা অত্যন্ত শক্তিশালী অথচ আলোকের সমস্ত নিয়ম মেনে চলে। যেহেতু বিদ্যুৎচৌম্বক রশ্মিগুলির মধ্যে একমাত্র আলোকরশ্মিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সাদা আলো সাতবর্ণের আলোর সমষ্টি। প্রত্যেকটি বর্ণের আলোকের আবার নিজস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যও আছে। লেসার ব্যবস্থার মাধ্যমেই কোন একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিশেষ বর্ণের আলোককে পৃথক করা যায়। অপরদিকে

তড়িৎচৌম্বক রশ্মিগুলির সমষ্টি থেকে ও একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোককেও পৃথক করা সম্ভব হয়ে থাকে। পরবর্তী পদ্ধতিকে লেসার না বলে মেসার বলা হয়। এটিও একটি সংক্ষেপিত নাম। পুরো নাম Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation।

লেসার উৎপাদনের মূলনীতি আলোর কণিকাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে। যেহেতু পদার্থের পরমাণুরা নানা শক্তিস্তরে বিরাজ করে। আলোকশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরমাণুর ইলেকট্রনরা এক শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে উন্নীত হয় এবং আলোর কণিকা বা ফোটন পরিত্যাগ করে উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে নেমে আসে। প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী কোন উৎস থেকে যখন আলোক নির্গত হয় তখন অসংখ্য কোয়াণ্টা বা ফোটনের আকারে বেরিয়ে আসে এবং ফোটনের মধ্যেই নিহিত থাকে শক্তি। উক্ত রশ্মিকে উৎপাদন করার সহজ উপায় হচ্ছে, দুই দর্পণের মধ্যে রক্ষিত কোন পদার্থের পরমাণুকে একটি ফোটন কণিকার সাহায্যে উত্তেজিতকরণ। এই অবস্থায় পরমাণুর ইলেকট্রনরা উচ্চ শক্তিস্তরে উন্নীত হয় এবং ফোটন কণিকা ত্যাগ করে নিম্ন শক্তিস্তরে অবতরণ করে। দুপাশে দর্পণ থাকায় দর্পণের উপর আপতিত ও প্রতিফলিত হওয়ার দরুণ পরমাণুর মধ্যে একটা শৃঙ্খল বিক্রিয়া চলতে থাকে এবং আলোর কণিকা বা ফোটন একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে পড়ে। আর তখনই এক ঝলক রশ্মি দর্পণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে।

অত্যন্ত তীব্র ও শক্তিশালী এই রশ্মিকে কোথাও প্রয়োগ করলে প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করে। তাই এর ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং গবেষণাও অব্যাহত আছে।

* ডিফ্রাক্সন গ্রেটিং কী ?

যে কোন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গপ্রবাহকে বিভিন্ন সংগঠক তরঙ্গমালায় বিশ্লিষ্ট করে ফেলার যান্ত্রিক সরঞ্জাম। ঐ যান্ত্রিক ব্যবস্থার

মাধ্যমে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গগুলির সমষ্টি বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বর্ণালীর সৃষ্টি করে। তাই কোন রশ্মি বা তরঙ্গপ্রবাহ একটি ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ বা রশ্মি সমবায়ে গঠিত তা নির্ণয় করা যায়।

* পোলারাইজড আলো কী এবং কেমন করে উৎপন্ন করা হয়?

বিশেষ উপায়ে আলোক তথা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্নমুখী ধারাপ্রবাহ থেকে একমুখী তরঙ্গকে পৃথক করার ব্যবস্থাকে বলে পোলারাইজেশন অব লাইট। সাধারণত পোলারয়েডের ভেতর দিয়ে সাধারণ আলোকরশ্মিকে পরিচালিত করলেই উৎপন্ন হয় পোলারাইজড লাইট। পোলারয়েড হচ্ছে সেলুলোজ নাইট্রেটের তৈরি এক ধরণের পাতলা ও স্বচ্ছ ফিল্ম। ঐ ফিল্মের উপর কুইনিন এবং আয়োডিনের একটি বিশেষ যৌগের চুর্ণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ যৌগটির দ্বারাই আলোকরশ্মি পোলারাইজড হয়—তথা একমুখী বিশেষ তরঙ্গগুলিই ওকে ভেদ করে যায় এবং অন্যান্য তরঙ্গ বাদ পড়ে।

* প্যারালাক্স কাকে বলে?

সুদূরের কোন বস্তু, যেমন আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদিকে বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে লক্ষ্য করলে তার অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে যায় ফলে মনে হয়। আবার এমনও দেখা গেছে, দর্শকের গতি কিংবা স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওদের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে বলে চোখে ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে অবস্থান ওদের পরিবর্তন হয় না, দৃষ্টিবিভ্রমই হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিবিভ্রমকেই বলা হয় প্যারালাক্স। আবার পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে আমরা যে অবস্থানে দেখি, সেটি তার প্রকৃত অবস্থান নয়। বিভিন্ন গাণিতিক নিয়মের সাহায্যে ঐ প্যারালাক্সকে সংশোধন করে নেওয়া হয়ে থাকে।

* চুম্বক কাকে বলে ?

যে বস্তু লোহার টুকরাকে আকর্ষণ করতে পারে এবং ঝুলন্ত অবস্থায় একটা নির্দিষ্ট মুখ সবসময় উত্তরদিকে রেখে ঝুলতে থাকে, তেমন বস্তুকে চুম্বক বলে।

* প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক চুম্বক কি ?

চৌম্বক ধর্ম বিদ্যমান এমন আকরিক, যাকে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক চুম্বক বলে। এশিয়া মাইনরের ম্যাগনেসিয়া নামক অঞ্চলে এই জাতীয় পদার্থ প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। ওকে ঝুলিয়ে রাখলে একটা নির্দিষ্ট মুখ সবসময় উত্তরদিকে থাকতো বলে দিক নির্ণয়ের কাজে ব্যবহার করা হতো। তাই ওর নাম দেওয়া হয়েছিল লোড্‌স্টোন বা পথপ্রদর্শক প্রস্তর। আসলে লোড্‌স্টোন লোহার একটি আকরিক, নাম ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4)। ওতে লোহার পরিমাণ শতকরা ৭২ ভাগ এবং বাকিটা অক্সিজেন। হয়ত ঐ চৌম্বক গুণ থাকায় জন্য ওর নামকরণ করা হয়েছে "ম্যাগনেটাইট"।

* কৃত্রিম চুম্বক কি ?

স্বাভাবিক চুম্বকের লোহাকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা এবং দিক নির্দেশক ক্ষমতা অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই কৃত্রিমভাবে লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধাতু অথবা কোন কোন সঙ্কর ধাতুকে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী চুম্বকে রূপান্তরিত করা হয়। এই জাতীয় চুম্বকই কৃত্রিম চুম্বক।

* স্থায়ী ও অস্থায়ী চুম্বক কাদের বলা হয় ?

যে সমস্ত পদার্থকে কৃত্রিমভাবে চুম্বকে পরিণত করলে চুম্বকটি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাদের বলা হয় স্থায়ী চুম্বক এবং যে সমস্ত পদার্থ চুম্বকে পরিণত হলে অতি অল্পকালের মধ্যে চুম্বকের গুণ হারিয়ে ফেলে

তাদের বলা হয় অস্থায়ী চুম্বক। সাধারণত ইস্পাত, টাংস্টেন স্টীল ও অন্যান্য কয়েকটি ধাতুসঙ্করকে চুম্বকে পরিণত করলে চুম্বক দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু কাঁচা লোহার তৈরী চুম্বক অস্থায়ী।

* চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ কি ?

লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ধাতুর ক্ষেত্রে দেখা যায়, অতি দুর্বল চুম্বকও এদের আকর্ষণ করতে পারে। তাই স্থায়ী চুম্বক তৈরী করতে হলে এদেরই প্রয়োজন হয়ে থাকে। অতএব চুম্বক দ্বারা যেসব বস্তু সহজে আকৃষ্ট হয় তাদেরই বলা হয় চৌম্বক পদার্থ। আর যারা অতি শক্তিশালী চুম্বকের দ্বারাও আকৃষ্ট হয় না তারা অচৌম্বক পদার্থ। লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ও ম্যাঙ্গানিজ এবং মানুষের তৈরী কতকগুলি সঙ্কর ধাতু ছাড়া আর সবই অচৌম্বক পদার্থ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কাঠ, কাগজ ও কাচ ছাড়া প্রায় সব পদার্থই অতি শক্তিশালী চুম্বকের দ্বারা কিছু কিছু প্রভাবিত হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে চুম্বকের আকর্ষণ অতি প্রবল, কারও ক্ষেত্রে ক্ষীণ, আবার কারও ক্ষেত্রে দেখা যায় অতি অল্প পরিমাণে বিকর্ষিত হচ্ছে। লোহা, নিকেল প্রভৃতির উপর চুম্বকের আকর্ষণ প্রবল বলে এদের বলা হয় অয়শ্চৌম্বক পদার্থ বা ফেরোম্যাগনেটিক সাবস্স্টেনস। প্লাটিনাম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির উপর আকর্ষণ অতীব ক্ষীণ বলে এরা পরাচৌম্বক পদার্থ বা প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেনস এবং অ্যান্টিমনি, বিসমাথ, সীসা, দস্তা, টিন, পারদ, জল প্রভৃতি মৃদু বিকর্ষিত হয় বলে এদের বলা হয় তিরশ্চৌম্বক পদার্থ বা ডায়াম্যাগনেটিক সাবস্টেনস্।

* কোন্ কোন্ পদার্থ লোহা অপেক্ষাও উন্নত চৌম্বক পদার্থ ?

টাংস্টেন স্টীল, কোবাল্ট স্টীল, লোহা ও সিলিকনের (৯৫ : ৫) সঙ্কর স্টেলয়, লোহা ও নিকেলের (৫০ : ৫০) সঙ্কর পারম্যালয়, লোহা নিকেল ও তামার (২২ : ৭৩ : ৫) সঙ্কর মিউ মেটাল, লোহা নিকেল কোবাল্ট ও অ্যালুমিনিয়ামের (৬৩ : ২০ : ৫ : ১২) সঙ্কর

এ্যালনিকো প্রধান। এ্যালনিকো আবার সবচেয়ে উন্নত।

* চৌম্বক আবেশ কাকে বলে?

কোন চুম্বকের কাছে যদি কোন চৌম্বক পদার্থকে আনা যায় তাহলে চৌম্বক পদার্থটি সাময়িকভাবে একটি চুম্বকে পরিণত হয়। যেমন, একটি চুম্বকের পাশে এক টুকরা লৌহখণ্ডকে রেখে খণ্ডটির অপর পাশে লোহার গুঁড়া ধরলে গুঁড়া তার গায়ে লেগে যায়। চুম্বক ও চৌম্বক পদার্থের উক্ত ধর্ম অর্থাৎ চুম্বক কর্তৃক সাময়িকভাবে চৌম্বক পদার্থকে রূপান্তরকরণের ঘটনাকে বলা হয় চৌম্বক আবেশ।

* চুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট হয় কিভাবে?

চুম্বককে জোরে আঘাত করলে, আছড়ালে, উত্তপ্ত করলে এবং পরবর্তী তড়িৎপ্রবাহ বা অলটারনেটিং কারেন্ট প্রেরণ করলে চুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

* কুরী বিন্দু কাকে বলে?

যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় চুম্বকের চুম্বকত্ব বজায় থাকে অথচ ঐ নির্দিষ্ট তাপমাত্রার একটু বেশী হলেই চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায় এমন নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে বলা হয় কুরী বিন্দু। ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর চুম্বকের ক্ষেত্রে কুরী বিন্দু বিভিন্ন। যেমন, লোহার তৈরি চুম্বকের কুরী বিন্দু ৭৫০° সেন্টিগ্রেড, নিকেলের ৩৫০° সেন্টিগ্রেড ইত্যাদি।

* চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা তার দেহের সর্বত্র কি সমান?

না। আকর্ষণ ক্ষমতা দু-প্রান্তের দিকেই সর্বাধিক। প্রান্ত থেকে মাঝখানের দিকে আকর্ষণ ক্রমশ কম। একেবারে মাঝখানে আকর্ষণ ক্ষমতা নেই বললেও চলে।

* চুম্বকের মেরু কাকে বলে?

একটি চুম্বককে লৌহচূর্ণের ভেতরে ডোবালে দেখা যায়, প্রান্তদ্বয়ের কাছাকাছি অঞ্চলে লৌহচূর্ণ সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছে। যে অঞ্চলদ্বয়ে চুম্বকের চৌম্বক ধর্ম তথা আকর্ষণ শক্তি প্রবল সেই অঞ্চল-দ্বয়কে চুম্বকের দুই মেরু বলা হয়। ঝুলিয়ে রাখলে যে মেরুটি উত্তর

দিকে থাকে তাকে বলা হয় উত্তর মেরু এবং যে মেরু দক্ষিণ দিকে থাকে তাকে বলা হয় দক্ষিণ মেরু। মেরুর অবস্থান একেবারে শেষ প্রান্তে নয়। প্রান্ত থেকে একটু ভেতরের দিকে থাকে।

* চুম্বককে মাঝখানে কেটে ফেলল কি মেরুদ্বয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে ?

না। কাটা অংশে বিপরীত মেরুর উদ্ভব হবে এবং প্রতিটি খণ্ড এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চুম্বকে পরিণত হবে।

* একটি চুম্বকের মেরুকে অপর একটি চুম্বকের মেরুর কাছে আনলে কি হবে ?

যদি সমমেরু হয় তাহলে বিকর্ষণ ঘটবে এবং অসমমেরু হলে আকর্ষণ করবে।

* যদি দুটি চুম্বককে এক জায়গায় রাখা হয় এবং সমান সমান মেরু যদি একই দিকে থাকে তাহলে কোন ক্ষতি হবে কি ?

ওরা উভয়ে উভয়ের উপর বিপরীত মেরু আবিষ্ট করতে চেষ্টা করবে বলে উভয়ের চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই চুম্বককে পাশাপাশি রাখতে হলে অল্প দূরত্বে একটি চুম্বকের বিশেষ একটি মেরুর দিকে অন্য চুম্বকের বিপরীত মেরু রেখে দুপাশে কাঁচা লোহার পাত দিয়ে দুটি চুম্বককে যুক্ত করে দিতে হয়। তাতে লোহার পাতে বিপরীত মেরু আবিষ্ট হয় এবং উভয় চুম্বকের মেরুগুলোকে বদ্ধ অবস্থায় রাখে। ঐ কাঁচা লোহার পাতকে বলা হয় চুম্বক রক্ষক।

* চৌম্বকক্ষেত্র কাকে বলে ?

কোন জায়গায় একটা চুম্বক রাখলে ঐ চুম্বকের আকর্ষণ চারদিকে যতদূর পর্যন্ত অনুভূত হয় ততদূর পর্যন্ত ক্ষেত্রকে বলা হয় চৌম্বকক্ষেত্র।

* কোন্ কোন্ ধরনের চুম্বক সাধারণত ব্যবহার করা হয় ?

দণ্ড চুম্বক, শলাকা চুম্বক ও অশ্বখুরাকৃতি চুম্বক—এই তিন ধরনের চুম্বককে সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

* চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করার পদ্ধতিগুলি কি কি ?

ঘর্ষণ পদ্ধতি ও বৈদ্যুতিক পদ্ধতি।

* তড়িৎ চুম্বকের উপাদান কি ?

নরম লোহা।

* চৌম্বক বলরেখা কাকে বলে?

কোন চৌম্বকক্ষেত্রে অবাধে চলনক্ষম একটি বিচ্ছিন্ন মেরুর সম্ভাব্য গতিপথ যে কাল্পনিক বক্ররেখা উৎপন্ন করে, সেই বক্ররেখাকে বলে চৌম্বক বলরেখা।

* পৃথিবী যে একটি চুম্বক তার প্রমাণ কি ?

একটি দণ্ড চুম্বককে সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে দেখা যায় চুম্বকটি মাটির সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে ঝুলতে থাকে। লোহাকে কিছুকাল ফাঁকা জায়গায় ফেলে রাখলেও তার মধ্যে চুম্বকের গুণ প্রকাশ পায়। তাছাড়া বর্তমানকালে মহাকাশে প্রেরিত অভিযানগুলি প্রমাণ করছে, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র বহু উর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত।

* পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ?

প্রায় চার হাজার মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র।

* পৃথিবীর চুম্বকত্বের উৎস কোথায় ?

নানাবিধ পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের শক্তি ভূপৃষ্ঠে সর্বাধিক এবং উপরের দিকে ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। উক্ত কারণে আগে পৃথিবীর চুম্বকত্ব সম্বন্ধে নানা জনে নানা মতবাদ পোষণ করেছিলেন। কেউ কেউ মনে করতেন, পৃথিবীর কেন্দ্রে আছে শক্তিশালী একটি চুম্বক। অথবা বিরাট একদণ্ড চুম্বক পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ করে দুদিকে মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। আবার কেউ কেউ মনে করতেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে বেশ কিছু পরিমাণ লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধাতু চুম্বকে পরিণত হয়ে নানা জায়গায় অবস্থান করছে। তাদের প্রভাবের জন্যই পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর মাটিতে পাওয়া স্বাভাবিক চুম্বক তথা লোডস্টোন দেখেই অনুরূপ সিদ্ধান্তগুলি পোষণ করা হয়েছিল।

বর্তমানে উপরোক্ত মতবাদগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে।

আজকের দিনে মনে করা হয়, পৃথিবীর কেন্দ্রে চুম্বক থাকতে পারে না। কারণ, পৃথিবীর কেন্দ্রে সব পদার্থই তরলের আকারে আছে এবং সেখানকার তাপমাত্রাও প্রচণ্ড। এত তাপমাত্রায় চুম্বক কিছুতেই তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখতে পারে না। অন্যদিকে মাটির অল্প গভীরতায় এত চুম্বক নেই—যার দ্বারা পৃথিবীর একটা চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হতে পারে। বিজ্ঞানীরা আরও প্রমাণ করেছেন, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রটা আবার ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। অতএব এই মতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে চুম্বক তৈরী অব্যাহত আছে বলতেই হবে। কিন্তু তা হতেই পারে না।

বর্তমান বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী-কেন্দ্রে বহু অর্ধ তরল পদার্থ বিদ্যমান। তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ অবশ্যই চলাচল করতে পারে। নানা পরীক্ষা থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীপৃষ্ঠে কিছু কিছু স্থিরতড়িৎ বিদ্যমান এবং আহ্নিকগতির জন্য পৃথিবীকে আবার পাকও খেতে হচ্ছে। অনেকের বিশ্বাস, পৃথিবীর আহ্নিকগতি ও চৌম্বকক্ষেত্র পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। আজকের দিনে তাই মনে করা হচ্ছে, আহ্নিকগতির প্রভাবে কেন্দ্রস্থিত তরল পদার্থের মধ্যে সর্বদাই একটা আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই আলোড়নের ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ। আর ঐ আবেশের ফলে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎতরঙ্গ। অতএব পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রটা পৃথিবীর কেন্দ্রে চুম্বকের জন্য নয়। বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলেই সৃষ্ট।

* পৃথিবীর বিস্তৃত চৌম্বকক্ষেত্রের জন্য সুবিধা কি হয়েছে ?

মহাকাশ থেকে আগত মারাত্মক রশ্মি ও কণিকাগুলি সরাসরি পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসতে পারছে না। তাই জীব ও উদ্ভিদের মঙ্গলই হয়েছে। আদিতে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র যখন অতিশয় দুর্বল ছিল তখন ওরা সরাসরি নেমে আসতো বলে পৃথিবীর বুকে দীর্ঘকাল উন্নত জীব ও উদ্ভিদের আগমন সম্ভব হয়নি। বর্তমানে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র

শক্তিশালী হওয়ায় মারাত্মক রশ্মি ও কণিকাগুলি হয় চৌম্বকক্ষেত্রে আটকে যাচ্ছে নয়ত পুনরায় মহাকাশেই ফিরে যাচ্ছে।

* চৌম্বক ঝটিকা কি ?

সূর্য থেকে সবসময়ই ঝাঁকে ঝাঁকে তড়িতাহিত কণিকা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। তাদের অধিকাংশ পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং অতি সামান্য পরিমাণ ভূপৃষ্ঠে নেমে আসছে। সৌর কলঙ্কের আবির্ভাবের সময় তড়িতাহিত কণিকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলে সেই সময় একটু বেশী সংখ্যায় ওরা পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয় এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে একটা চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। (কারণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন ধাতব পরিবাহীর ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে থাকলে পরিবাহীর চারদিকে একটা চৌম্বকক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।) এই অবস্থায় পৃথিবীর বেতারবার্তা, টেলিফোন যোগাযোগ ইত্যাদির একটু গোলমাল হয়ে পড়ে। তখনই বলা হয় চৌম্বক ঝটিকা।

তড়িৎ

* স্থিরতড়িৎ কাকে বলে ?

যে তড়িৎ কোন বস্তুতে সবসময় আবদ্ধ থাকে কিন্তু চলাচল করতে পারে না তাকেই বলা হয় স্থিরতড়িৎ।

* তড়িতের পরিবাহী ও অপরিবাহী কাদের বলা হয় ?

যে সমস্ত পদার্থের ভেতর দিয়ে তড়িৎ সহজে চলাচল করতে পারে তাদের বলা হয় পরিবাহী। ধাতু, মাটি, মানবদেহ, ইত্যাদি উত্তম তড়িৎ পরিবাহী।

আর যে সমস্ত পদার্থের ভেতর দিয়ে তড়িৎ চলাচল করতে পারে না তারাই অপরিবাহী। কাঠ, কাগজ, মোম, ইবোনাইট, বেকেলাইট, পোরসিলেন, কাচ, শুষ্ক বায়ু প্রভৃতি এই জাতীয়।

মনে রাখতে হবে, কোন পদার্থই সম্পূর্ণরূপে তড়িতের অপরিবাহী নয়। তথাকথিত অপরিবাহীর মধ্যে অতি অল্প হলেও তড়িৎ প্রবাহিত

হয়। তবে পরিমাণটা এত কম যে, তাকে সহজে উপেক্ষা করা যায়।

* ইলেক্‌ট্রিফিকেশন বা তড়িতাহিতকরণ নামটি কার দেওয়া এবং এই নামকরণ তিনি কেন করেছিলেন?

বিজ্ঞানী গিলবার্ট ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ইলেক্‌ট্রিফিকেশন নামটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। অ্যামবার নামক পাইন গাছের শক্ত আঠাকে রেশমী কাপড় দিয়ে ঘষলে ছোট ছোট কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করে। এই সত্যটি প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতেরাই উদ্ভাবন করেছিলেন। গিলবার্ট এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন, শুধু অ্যামবার নয় আরও বহু পদার্থ অনুরূপ আচরণ করে। কিন্তু তিনি অ্যামবারকে পরিত্যাগ করলেন না। যেহেতু গ্রীক ভাষায় অ্যামবারকে বলা হয় "ইলেকট্রন"। তাই অ্যামবারের সাহায্যে তড়িতাহিতকরণকে নাম দিয়েছিলেন ইলেক্‌ট্রিফিকেশন।

* বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় খুঁটির মাথায় পোরসিলেনের বাটির মাধ্যমে তারকে যুক্ত করা হয় কেন?

পোরসিলেন তড়িতের অপরিবাহী। অর্থাৎ তড়িৎ ওর ভেতর দিয়ে চলাচল করতে পারে না। তাই পোরসিলেনকে অন্তরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সরাসরি খুঁটির মাথায় তারকে যুক্ত করলে খুঁটির মাধ্যমে তড়িৎক্ষরণ ঘটতো। তাতে কেউ সেই খুঁটিকে ছুঁয়ে ফেললেই তড়িৎপৃষ্ঠ হয়ে মারা যেতো। পোরসিলেনের বাটি ব্যবহার করার জন্য অনুরূপ ভয় থাকে না। তাছাড়া বিদ্যুৎ নষ্ট হওয়ারও ভয় নেই।

* বাজারে যেসব বৈদ্যুতিক তার পাওয়া যায় তার উপর সূতা বা রবার জড়ানো থাকে কেন?

সূতা, রবার প্রভৃতি তড়িতের অপরিবাহী। তড়িৎপ্রবাহের সময় দুটি তার একসঙ্গে ঠেকে গেলে কাজের অসুবিধা হবে বলে অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে মোড়া থাকে।

* কাচদণ্ডকে সিল্কের কাপড় দিয়ে এবং ইবোনাইটকে পশমের কাপড় দিয়ে ঘষলে কোনটাতে কি ধরনের তড়িৎ উৎপন্ন হবে?

কাচদণ্ডে ধনাত্মক ও সিল্কের কাপড়ে ঋণাত্মক তড়িৎ উৎপন্ন হবে এবং ইবোনাইটে উৎপন্ন হবে ঋণাত্মক তড়িৎ ও পশমে ধনাত্মক তড়িৎ।

* কাচদণ্ডকে পশমের কাপড় দিয়ে এবং ইবোনাইটকে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষলে কোথায় কি ধরনের বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে ?

এক্ষেত্রে কাচদণ্ডে ঋণাত্মক ও পশমে ধনাত্মক তড়িৎ এবং ইবোনাইটে ঋণাত্মক তড়িৎ ও সিল্কে ধনাত্মক তড়িৎ পাওয়া যাবে। আসলে কোন বস্তুকে অন্য কোন বস্তু দিয়ে ঘষলে কোথায় কি ধরনের তড়িৎ উৎপন্ন হবে তার একটি তালিকা আছে। তালিকার মধ্যে যেটি উপরে অবস্থান করছে সেখানে পাওয়া যাবে ধনাত্মক তড়িৎ এবং অপেক্ষাকৃত নিচে যার অবস্থান সেখানে উৎপন্ন হবে ঋণাত্মক তড়িৎ। তালিকাটিতে ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত কতকগুলি পদার্থ দিয়ে সাজানো হয়েছে।

(১) পশম (২) ফ্লানেল (৩) গালা (৪) মোম (৫) কাচ (৬) কাগজ (৭) রেশম (৮) মানবদেহ (৯) কাঠ (১০) ধাতব পদার্থ (১১) রবার (১২) রজন (১৩) অ্যাম্বার (১৪) গন্ধক (১৫) ইবোনাইট (১৬) গাটাপার্চা।

* ঘর্ষণের ফলে দুটি বস্তুতে দু' ধরনের তড়িৎ উৎপন্ন হয় কেমন করে ?

প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুতে কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস এবং কেন্দ্রীনের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে ইলেকট্রনরা। কেন্দ্রীনে যতটি ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট কণিকা প্রোটন থাকে কেন্দ্রীনের চারদিকে পরিভ্রমণরত অবস্থায় থাকে ঠিক ততটি ঋণাত্মক কণিকা ইলেকট্রন। তাই পরমাণু মাত্র বাহির থেকে তড়িৎ নিরপেক্ষ মনে হয়।

আবার দেখা গেছে পরমাণুতে নিজস্ব ইলেকট্রন থাকা সত্ত্বেও অপর কোন উৎস থেকে ইলেকট্রন গ্রহণের আসক্তি আছে। ঐ আসক্তি সবার ক্ষেত্রে সমান নয়। যারই আসক্তি বেশী সে অন্য পদার্থের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে। এক বস্তুকে আর এক বস্তু দিয়ে ঘর্ষণ করলে যার আসক্তি বেশী সে অন্য বস্তুর পরমাণু থেকে

ইলেকট্রন গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু প্রোটন তথা ধনাত্মক আধান স্থানান্তরিত হতে পারে না বলে সে ঠিক ঠিক থেকে যায়। যেহেতু ইলেকট্রন তড়িৎ ঋণাত্মক। তাই যে বস্তু ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে অতিরিক্ত ঋণাত্মক তড়িৎ গ্রহণের ফলে তড়িৎ ঋণাত্মক হয়ে পড়ে। আর যে বস্তুটি ইলেকট্রন বর্জন করতে বাধ্য হয় তার তড়িৎসাম্য নষ্ট হয়ে যায় বলে আপনিই সেটি ধনাত্মক হয়ে পড়ে।

* বজ্ররক্ষী কি?

বজ্রপাত থেকে অট্টালিকা বা মন্দির ইত্যাদিকে রক্ষা করার জন্য এদের গায়ে ব্যবহৃত ধাতব দণ্ডকে বজ্ররক্ষী বলা হয়। দণ্ডটির একপ্রান্তে কয়েকটি সূচীমুখ থাকে এবং ঐ প্রান্তটি অট্টালিকার ছাদ অথবা মন্দিরের চুড়া থেকে বেশ কিছুটা উপরে থাকে। আর অপর প্রান্তটি থাকে মাটির কিছুটা গভীরে প্রোথিত অবস্থায়। যখন কোন তড়িৎগ্রস্ত মেঘ ওর উপরে আসে তখন সূচীমুখে আবেশের ফলে বিপরীত তড়িতের সৃষ্টি হয় এবং দণ্ডটির বিপরীত প্রান্তে তথা মাটির তলার প্রান্তে উৎপন্ন হয় মেঘের সমতড়িৎ। কিন্তু ঐ তড়িৎ সেখানে জমা থাকতে পারে না। সরাসরি মাটিতে চলে যায়। কিন্তু সূচীমুখে বিপরীত তড়িৎ ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় সূচীমুখ দিয়ে একটু একটু করে আধান নির্গত হয়ে চারপাশের বায়ুকণাকে তড়িৎগ্রস্ত করে। এই তড়িৎ সূচীমুখের সমতড়িৎ বলে মেঘের বিপরীত আধানযুক্ত। তাই বিপরীত আধান মেঘের দিকে আকর্ষিত হয় এবং মেঘের আধানকে প্রশমিত করে। ফলে বজ্রপাতের ভয় থাকে না। যদি বা কোন সময় ঘটে তাহলে আকাশের বিদ্যুৎ সূচীমুখ দিয়ে মাটিতে প্রবেশ করে। অট্টালিকা বা মন্দিরের কোন ক্ষতি হয় না।

* তড়িৎ-বিভব ও তড়িৎপ্রবাহ কাকে বলে?

একটি বেশ মোটা এবং একটি সরু চোঙে জল রেখে যদি দুটির নিম্নাংশ পরস্পর নলদ্বারা যুক্ত করার ব্যবস্থা থাকে এবং নলের মাঝখানে খুশিমত খোলা ও বন্ধ করার জন্য স্টপ কক থাকে তাহলে

দেখা যাবে, মোটা পাত্রে জলের পরিমাণ খুব বেশী থাকা সত্ত্বেও সরু চোঙে জলের উচ্চতা যদি বেশী থাকে তাহলে ঐ সরু চোঙ থেকে জল মোটা চোঙের দিকে প্রবাহিত হতে থাকবে। উভয় চোঙের জলের উচ্চতা যতক্ষণ সমান না হচ্ছে ততক্ষণ ধরে চলতে থাকবে এই প্রবাহ।

তেমনই সমতড়িতাধানে আহিত দুটি পরিবাহীকে কোন অন্তরকের উপর রেখে পরিবাহী দুটিকে যদি ধাতব তার দিয়ে যোগ করা যায় তাহলে এক পরিবাহী থেকে অন্য পরিবাহীতে তড়িতাধান প্রবাহিত হবে। এক্ষেত্রেও পরিবাহীর মোট আধানের উপর প্রবাহ নির্ভর করবে না। কেবলমাত্র নির্ভর করবে পরিবাহীর তড়িতাবস্থার উপর। তাই দুটি পারবাহীকে পরস্পরযুক্ত করলে ওদের যে তড়িতাবস্থা পরস্পরের মধ্যে আধান বিনিময়ের দিক নির্দেশ করে তাকেই বলা হয় তড়িত বিভব।

উচ্চচাপযুক্ত স্থান থেকে যেমন নিম্নচাপযুক্ত স্থানে জল প্রবাহিত হয় তেমনই ধনাত্মক আধান তথা উচ্চবিভবযুক্ত স্থান থেকে নিম্নবিভবযুক্ত স্থানে প্রবাহিত হয় এবং ঋণাত্মক আধান বিপরীতে প্রবাহিত হয়। তড়িতাধানের এই প্রবাহকে বলে তড়িৎপ্রবাহ।

* ডি. সি. বা সমপ্রবাহ (Direct Current) এবং এ. সি. বা পরিবর্তী প্রবাহ (Alternating Current) কাদের বলা হয় ?

যে তড়িৎপ্রবাহ সর্বদা একই দিকে হয়ে থাকে তাকে বলা হয় সমপ্রবাহ এবং যে তড়িৎ প্রবাহের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পর্যায়ক্রমে অভিমুখ পরিবর্তিত হয় তাকেই বলে পরিবর্তী প্রবাহ।

* তড়িৎকোষ কি ?

যে ব্যবস্থায় রাসায়নিক শক্তির বিনিময়ে স্থায়ী বিভবপ্রভেদের সৃষ্টি করা হয় তথা স্থায়ী তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায়, সেই ব্যবস্থাকে বলে তড়িৎকোষ। যেমন সরল ভোল্টীয় কোষে দস্তার পাত ও পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন তামার পাত বেয়ে উপরে উঠে এবং স্থায়ী তড়িৎবিভবের সৃষ্টি হয়। এখানে

ব্যবহৃত তামার পাত উচ্চ তথা ধনাত্মক বিভব এবং দস্তার পাত নিম্ন বা ঋণাত্মক বিভবসম্পন্ন পাত। তড়িৎকোষের উপাদান একটি পাত্র, পাত্রের মধ্যে তড়িৎ দ্বারা বিশ্লেষণক্ষম কোন রাসায়নিক পদার্থ, এবং ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দুটি তড়িদ্বার।

* মৌলকোষ কাকে বলে ?

যে সমস্ত কোষে বিভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করা হয় তাদেরই বলা হয় মৌলকোষ।

* মৌলকোষের প্রধান প্রধান অংশগুলি কি কি ?

একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক তড়িদ্বার, বিভবপ্রভেদ সৃষ্টিকারী, কোন তরল এবং ছদন নিবারক কোন বস্তু।

* স্থানীয় ক্রিয়া (Local action) এবং ছদন (Polarisation) কাকে বলে ?

ঋণাত্মক তড়িদ্বার হিসাবে যে দস্তার পাত ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেই দস্তার মধ্যে নানা অশুদ্ধি থাকে। দস্তার পাত অ্যাসিডে ডোবালে ঐ অশুদ্ধিগুলি দস্তার পাতের গায়ে নিজেরাই এক-একটা স্থানীয় কোষ গঠন করে। এরা যে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে তা মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয় না। উক্ত কারণে মূল প্রবাহ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কোষের এটি একটি ত্রুটি এবং এই ত্রুটিটিকে স্থানীয় ক্রিয়া বলা হয়।

ছদন সাধারণ ভোল্টীয় কোষের অন্যমত ত্রুটি। ধনাত্মক তড়িদ্বার হিসাবে যে তামার পাত ব্যবহার করা হয়, তড়িৎপ্রবাহ চলাকালে উৎপন্ন ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়ন তামার পাত বরাবর ধনাত্মক আধান দিয়ে বুদবুদের আকারে বেরিয়ে যায়। কিন্তু যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন মুক্ত হয় সে পরিমাণ আধান মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। কিছু কিছু ঐ তামার পাতের গায়েই সঞ্চিত হয় এবং একটা স্তর সৃষ্টি করে। ঐ স্তর কুপরিবাহী হওয়ায় ধীরে ধীরে স্তর বেড়ে উঠলে তড়িৎপ্রবাহ কমে আসে। উক্ত ক্রিয়াই

ছদন নামে খ্যাত।

* ল্যাকল্যান্স কোষে কোন্ তরল গ্রহণ করা হয় এবং কিসের তড়িদ্বার ব্যবহার করা হয় ?

তরল হিসাবে ব্যবহার করা হয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং ধনাত্মক তড়িদ্বার হিসাবে কার্বনদণ্ডকে ও ঋণাত্মক তড়িদ্বার হিসাবে পারদের প্রলেপ দেওয়া দস্তাদণ্ডকে ব্যবহার করা হয়। পারদের প্রলেপ দেওয়া হয় স্থানীয় ক্রিয়া বন্ধ করার জন্য।

* নির্জল কোষ কাকে বলে ?

যে কোষে কোন তরল ব্যবহার করা হয় না তাকেই বলে নির্জল কোষ। টর্চলাইটের ব্যাটারী এই জাতীয়। তবে প্রকৃতপক্ষে ওরা নির্জল নয়। এক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণের পরিবর্তে তার লেই ব্যবহার করা হয়।

* গৌণ বা সঞ্চয়ক কোষ কাকে বলে ?

এমন কিছু কিছু কোষকে ব্যবহার করা হয় যেগুলি থেকে মৌল-কোষের মত রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় না। এখান থেকে তড়িৎশক্তি পেতে হলে ডায়নামো থেকে এর ভেতরে কিছুক্ষণ বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়ে কোষকে আহিত করে নেওয়া হয়। অতঃপর কোষের ভেতরে বিদ্যুৎশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত ও সঞ্চিত হয়। পরে সেই সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে।

* ফটো সেল কি বস্তু ?

উক্ত সেলের দ্বারা আলোকশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

* সৌরশক্তিকে কেমন করে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় ?

শক্তিশালী আয়না বা লেন্সের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে প্রথমে তাপ সৃষ্টি করা হয়। তারপর থার্মোকাপল বা ফটো সেলের উপর ফেলে বিভবপ্রভেদ সৃষ্টি করা হয়। এই সেলে উৎপন্ন

ভোল্টেজ খুব কম বলে বাতি জ্বালাতে গেলে অনেকগুলি সেলের দরকার হয়।

* সঞ্চয়ক কোষে কোন্ ধাতু ব্যবহার করা হয় ?

সীসা।

* টর্চের ব্যাটারী ফুরিয়ে যাওয়ার পর রোদে দিয়ে কি কাজের উপযোগী করা যেতে পারে ?

না। টর্চের ব্যাটারী ড্রাই সেল বা নির্জল কোষ। উক্ত কোষে যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভবপ্রভেদ সৃষ্টি হয় সে সব বিক্রিয়া একমুখী। তবে অনেক সময় তাপ প্রয়োগে সামান্য আয়নন ঘটে এবং অল্প স্বল্প বিভবপ্রভেদেরও সৃষ্টি হয়। তবে তা কাজের উপযোগী হয় না বললেও চলে।

* রোধ কি ?

কোন পরিবাহীর ভেতর দিয়ে যখন তড়িৎপ্রবাহ চলে তখন কয়েকটা কারণে ঐ প্রবাহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়। ঐ বাধাগুলিকে বলা হয় রোধ। যেমন পরিবাহীর তার যত সরু হয় ততই রোধ বা বাধা বাড়ে এবং যত লম্বা হয় তত রোধ বাড়ে। আবার বস্তুর উপাদানের উপরও রোধ নির্ভর করে। দেখা গেছে, তামার তারের রোধ লোহার তারের চেয়ে কম। অপরদিকে উষ্ণতা বাড়লেও রোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

* বিদ্যুৎ সরবরাহের তার মোটা করা হয় কেন ?

তার মোটা হওয়ার জন্য রোধ কম। তাই বিদ্যুৎ পরিমাণে কম নষ্ট হয়।

* তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে রোধ বাড়ে এই সত্যের ব্যতিক্রম কোথায় কোথায় ?

কার্বনের ক্ষেত্রে ও ভলকানাইজড্ রবারের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যতিক্রম দেখা যায়। আবার সেলেনিয়াম নামক ধাতুটি আলোকরশ্মির প্রভাবে রোধ হ্রাস পায়।

* একটি আদর্শ ভোল্টামিটারের রোধ কত হওয়া উচিত ?

অসীম।

* ওহম সূত্রটি কি ?

তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা পরিবর্তিত না হলে কোন পরিবাহীর প্রবাহমাত্রা ওর উভয়প্রান্তের বিভবপ্রভেদের সমানুপাতিক। অর্থাৎ প্রবাহমাত্রাকে I ধরলে এবং পরিবাহীর দুপ্রান্তের বিভবকে যথাক্রমে V_A ও V_B ধরলে $V_A - V_B \propto I$ হবে বা $\frac{V_A - V_B}{I} = R$ হবে।

[এখানে R = ধ্রুবক তথা পরিবাহীর রোধ।]

* একটি তারের দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার এবং প্রস্থচ্ছেদ ১ বর্গ মিমি, অপর একটি তারের দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার কিন্তু প্রস্থচ্ছেদ ২ বর্গ মিমি। কোনটির রোধ বেশী হবে ?

এক্ষেত্রে দুটি তারেরই রোধ সমান হবে। রোধ দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক কিন্তু প্রস্থচ্ছেদের ব্যস্তানুপাতিক। তাই দৈর্ঘ্য বাড়লে রোধ বাড়ে এবং প্রস্থচ্ছেদ বাড়লে রোধ কমে। প্রথম তারের দৈর্ঘ্য কম এবং প্রস্থচ্ছেদ মাত্র ১ বর্গ মিমি কিন্তু দ্বিতীয়টির দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলেও প্রস্থচ্ছেদও দ্বিগুণ।

* সীবেক ক্রিয়া কাকে বলে ?

কোন তড়িৎ কোষের সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর দুটি দণ্ড অথবা তারের একটির একপ্রান্তের সঙ্গে অন্যটির একটি প্রান্তকে ঝালাইর দ্বারা সংযুক্ত করে সংযোগের মুখে দুটিতে ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা প্রয়োগ করলেও তড়িৎপ্রবাহ পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী সীবেক তথ্যটি আবিষ্কার করেছিলেন বলে উক্ত তাপীয় ক্রিয়াকে বলা হয় সীবেক ক্রিয়া। অনুরূপ ক্রিয়ার উপযোগী সংযুক্ত দুই তারকে তারযুগ্ম বা "থার্মোকাপল" নাম দেওয়া হয়েছে।

* পেলটিয়ার ক্রিয়া কি ?

বিজ্ঞানী পেলটিয়ার কর্তৃক আবিষ্কৃত সীবেক ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া। উক্ত ক্রিয়া অনুসারে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধাতব তারের প্রান্ত

তুটিকে সংযুক্ত করে এবং সংযোগস্থলের ভেতর দিয়ে ব্যাটারীর মাধ্যমে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে প্রবাহের অভিমুখ অনুসারে সংযোগস্থলের একদিকে তাপ শোষিত হয় ও অপরদিকে তাপমাত্রা বর্ধিত হয়। এক কথায় সংযোগস্থলের তুদিকে তাপমাত্রার ব্যবধান সৃষ্টি করে।

* বৈদ্যুতিক ফিউজ কাকে বলে ?

সীসা ও টিনের (৭৫ : ২৫) তৈরী সঙ্কর ধাতুর তার বিশেষ। কোন তড়িৎ বর্তনীতে হঠাৎ যদি প্রবাহমাত্রা বেড়ে যায় তাহলে মূল যন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে বলে ফিউজ তার দিয়ে যুক্ত রাখতে হয়। গলনাঙ্ক কম বলে তাপমাত্রা বেড়ে উঠলে ফিউজ তারটাই গলে যায় কিন্তু যন্ত্রের কোন ক্ষতি হয় না।

* বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলে কেমন করে ?

বাল্বের ভেতরে উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট কোন ধাতু অথবা কার্বনের সূক্ষ্ম তন্তু বা ফিলামেণ্ট লাগানো থাকে। বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালে প্রবাহ তন্তুর ভেতর দিয়ে গমন করে এবং তন্তুকে উত্তপ্ত করে। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতার উর্ধ্বে সেটি ভাস্বর হয়ে উঠে এবং আলো বিতরণ করতে থাকে।

যেহেতু সূক্ষ্ম তারের রোধ খুব বেশী। অপরদিকে উপাদানের গলনাঙ্কও বেশী। উচ্চ রোধের জন্যই সেটি আলো বিকিরণ করার মত তাপমাত্রা লাভ করে। রোধকে আরও বেশী করার জন্য বেশ সুদীর্ঘ তার ব্যবহার করা হয় এবং কুণ্ডলীর মত করে বাল্বের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

* বৈদ্যুতিক বাল্বকে বায়ুশূন্য অথবা নিষ্ক্রিয় গ্যাস দ্বারা ভর্তি করা হয় কেন ?

উচ্চ উষ্ণতায় ফিলামেণ্ট অল্পে অল্পে বাষ্পীভূত হয়। তথা ধাতব ফিলামেণ্ট থেকে ইলেকট্রনের স্রোত নির্গত হয়। সেই ইলেকট্রন স্রোতকে তীব্র গতিশীল করার জন্য বায়ুশূন্য করা হয় বাল্বকে। নিষ্ক্রিয় গ্যাস দ্বারা ভর্তি করলে ফিলামেণ্ট বাষ্পীভূত হয় কম পরিমাণে এবং

বাল্ব বেশীদিন টেকে।

* ফিউজের তার ইলেকট্রিক হিটারে ব্যবহার করা হয় না কেন ?

ফিউজের তারের গলনাঙ্ক কম বলে হিটারের উষ্ণতায় টিঁকে থাকতে পারে না, ব্যবহার করলেই গলে যাবে।

* টিউবলাইট জ্বলে কেমন করে ?

সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের মত টিউবলাইটের গঠন নয়। বদ্ধ কাচনলের দুপাশ থেকে ভেতরে দুটি তড়িদ্বার ঢোকানো থাকে। ভেতরে থাকে নিম্নচাপের পারদ বাষ্প ও কিছু কিছু নিষ্ক্রিয় আর্গন গ্যাস। তাছাড়া ভেতরের দেওয়ালে ফ্লুরোসেন্ট রঙের প্রলেপও দেওয়া হয়। যখন বিদ্যুৎ পাঠানো হয় তখন উত্তপ্ত হয়ে তড়িদ্বার থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে দুই তড়িদ্বারের ভেতরের জায়গাটুকুতে ছুটাছুটি করে বেড়ায় এবং গ্যাসকে ধাক্কা দেয়। এই অবস্থায় গ্যাসেও তড়িৎ মোক্ষণ শুরু হয় এবং আলোর উৎপত্তি হয়। এক্ষেত্রে পারদ বাষ্প থেকে যে আলোর মোক্ষণ ঘটে তাকে দেওয়ালের ফ্লুরোসেন্ট প্রলেপ শোষণ করে নিয়ে অন্য আলো তথা দৃশ্যমান আলো উপহার দেয়।

* তড়িৎপ্রবাহের তাপীয় ফল সম্পর্কিত জুলের সূত্র কি ?

(১) রোধ ও সময় অপরিবর্তিত থাকলে উদ্ভূত তাপ প্রবাহমাত্রার বর্গের সমানুপাতিক।

(২) রোধ ও প্রবাহমাত্রা অপরিবর্তিত থাকলে উদ্ভূত তাপ সময়ের সমানুপাতিক।

(৩) প্রবাহমাত্রা ও সময় অপরিবর্তিত থাকলে উদ্ভূত তাপ রোধের সমানুপাতিক।

* তড়িৎপ্রবাহের তাপীয় ফল কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় ?

বৈদ্যুতিক হিটার ও স্টোভ, বৈদ্যুতিক বাল্ব, আর্ক ওয়েলডিং যন্ত্র, বৈদ্যুতিক ফার্নেস ইত্যাদিতে।

* তড়িৎপ্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া কি ?

কোন তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালে তারের চারদিকে

একটা চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। ঐ চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে একটা চুম্বক শলাকাকে স্থাপন করলে শলাকাটির উপর দুটি বল ক্রিয়া করে। প্রথম, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রজনিত বল এবং দ্বিতীয় প্রবাহমাত্রার চৌম্বকক্ষেত্রজনিত বল। ঐ দুই বলের জন্য শলাকাটি বিক্ষিপ্ত হয়ে কোন একটি অবস্থানে স্থির হয়ে থাকবে। অপরদিকে তড়িৎ পরিবাহী কোন তারকে চুম্বকের কাছে আনলেও পরিবাহীর উপর একটি বল প্রযুক্ত হয়।

* তড়িৎপ্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া—এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রটি কি?

বৈদ্যুতিক মোটর। এখানে তড়িৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

* তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ কাকে বলে?

কোন সংহত তার কুণ্ডলীকে যদি চৌম্বকক্ষেত্রে নড়ানো যায় অথবা একটি চুম্বককে যদি কোন সংহত তার কুণ্ডলীর কাছে নড়ানো যায় তাহলে ঐ কুণ্ডলীতে একটি ক্ষণস্থায়ী তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। উক্ত প্রবাহকে বলা হয় আবিষ্ট প্রবাহ এবং সমগ্র ঘটনাটিকে বলা হয় তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ। তথ্যটি ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে মাইকেল ফ্যারাডে কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে।

* ডাইনামো কি?

তড়িৎপ্রবাহ সরবরাহের কাজে একান্ত অপরিহার্য বিদ্যুৎযন্ত্রকে ডায়নামো বা জেনারেটর বলা হয়। উক্ত যন্ত্রের মূলনীতি তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি তারের বদ্ধ কুণ্ডলীকে শক্তিশালী কোন চুম্বকের দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে ঘোরানোর ব্যবস্থা থাকে। ফলে চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা সর্বদা পরিবর্তিত হয় এবং তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের ফলে কুণ্ডলীতে তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হয়।

ডায়নামো দু-রকমের। যে ডায়নামো কোন বর্তনীতে পরিবর্তী প্রবাহ উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় এ. সি. ডায়নামো এবং যে

ডায়নামো বর্তনীতে সমতড়িৎ উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় ডি. সি. ডায়নামো।

* এ. সি. কারেন্ট থেকে কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে ডি. সি. কারেন্ট পাওয়া যায় ?

রেকটিফায়ার বা ডায়ড ভাল্ব।

* ক্যাথোড রশ্মি কাকে বলে ?

প্রায় ৩০ সে. মি. দীর্ঘ ও ৪ সে. মি. ব্যাসের বদ্ধ কাচনলের দুপাশে ঋণাত্মক তড়িদ্বার বা ক্যাথোড ও ধনাত্মক তড়িদ্বার বা অ্যানোড যুক্ত করে নলের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বায়ু নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করলে এবং তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে নলের ভেতরের বায়ুর চাপ যখন ০'০১ মিমি পারদস্তম্ভের সমান হয় তখন নলের ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে কিন্তু ক্যাথোডের বিপরীতের দেওয়াল প্রতিপ্রভা হয়ে উঠে। এই প্রতিপ্রভা এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণিকার নির্গমনের ফলেই সৃষ্ট। উক্ত প্রতিপ্রভা তথা কণিকাস্রোতকে বলা হয় ক্যাথোড রশ্মি। পরে গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে কণিকাগুলি ইলেকট্রন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

* ইলেকট্রনে তড়িতাধান ও ভর কত ? এবং প্রথম কে পরিমাপ করেছিলেন ?

ইলেকট্রনের তড়িতাধান $(e) = ১\cdot৬ \times ১০^{-২০}$ e. m. u. বা $৪\cdot৮ \times ১০^{-১০}$ e. s. u.

ইলেকট্রনের ভর $(m) = ৯\cdot১ \times ১০^{-২৮}$ গ্রাম। বিজ্ঞানী মিলিকনিই প্রথম এগুলি নির্ণয় করেছিলেন।

* এক্স-রশ্মি কি ?

এক্স-রশ্মি আলোকের মতই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। পাতলা ধাতব পাত, কাগজ, চামড়া প্রভৃতিকে সাধারণ আলো ভেদ করতে পারে না কিন্তু এক্স-রশ্মি পারে।

উক্ত রশ্মির আবিষ্কারক উইলহেল্‌ম রনজেন। কিন্তু সেদিন তিনি

রশ্মিটির প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারেননি। কেবল লক্ষ্য করেছিলেন, তড়িৎমোক্ষণ নল থেকে ক্যাথোড রশ্মি যখন দেওয়ালে পড়ে তখন এই রশ্মির উদ্ভব হয়। অজানা এই রশ্মির তিনিই নামকরণ করেছিলেন এক্স-রশ্মি বা অচিন রশ্মি। পরে জানা গেছে, অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোন প্রতিবন্ধকে বাধাপ্রাপ্ত হলে এমন ভেদনক্ষমতাসম্পন্ন রশ্মির উদ্ভব হয়।

* ক্যাথোড রশ্মি ও এক্স রশ্মির মধ্যে কার ভেদন ক্ষমতা বেশী ?

এক্স রশ্মির।

* বৈদ্যুতিক তারে পাখী বসলে পাখী মারা যায় না কেন ?

পাখী একটি তারে বসলে মারা যায় না। কিন্তু দুটি তার স্পর্শ করলে মারা যাবে। কারণ, দুটি তারের একটি ধনাত্মক ও অপরটি ঋণাত্মক বিভবসম্পন্ন বলে উড়তে উড়তে পাখীর ডানাদুটো যদি দুটি তারকেই স্পর্শ করে তাহলে পাখীর দেহের ভেতর দিয়ে উচ্চমানের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। তার ফলেই পাখী মারা যায়। কিন্তু একটি তারের উপর বসলে তাদের শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না। অপরদিকে পাখীরা আবার আকারে ছোট এবং তার দুটির ব্যবধান ও বেশ। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ডানাদুটি তারদ্বয়কে স্পর্শ করতে পারে না।

* রেডিও এবং টেলিভিশন মাধ্যমে সংবাদ, গানবাজনা চিত্র ইত্যাদি কেমন করে ধরা পড়ে ?

বেতারকেন্দ্রের প্রেরক যন্ত্র থেকে উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গ অ্যানটেনার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট কোণে উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। উক্ত তরঙ্গ পৃথিবীর উপরিভাগে আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় পৃথিবীপৃষ্ঠেই ফিরে আসে এবং ধরা পড়ে গ্রাহক যন্ত্রে। ঐ বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাত্র কয়েক মিটার থেকে কয়েকশ' মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বেতার কেন্দ্রে ট্রান্সমিটার নামক যন্ত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় ঐ উচ্চ

কম্পাঙ্কের তরঙ্গ উৎপাদন করে তাতে নিম্ন কম্পাঙ্কের শব্দ বা কোন সিগ্ন্যাল মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় মডুলেশন। অপরপক্ষে নিম্ন কম্পাঙ্কের শব্দ বা সিগন্যালকে বাহক তরঙ্গ আখ্যা দেওয়া হয়।

বাহক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক যত বেশী হয় ততই বেশী সিগ্ন্যাল প্রেরণ করতে সুবিধা হয়। কথাবার্তা, গানবাজনার ক্ষেত্রে কম কম্পাঙ্ক-বিশিষ্ট বেতার তরঙ্গ হলে চলে কিন্তু চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হলে উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

বেতার গ্রাহক যন্ত্রে থাকে কনডেন্সর বা বিদ্যুৎধারক, তারের কুণ্ডলী, উপযুক্ত মানের রোধ, ট্রান্সফরমার, রেডিও ভাল্ব, লাউডস্পীকার ইত্যাদি। যন্ত্রকে সমপ্রবাহ বা ডি. সি. কারেন্ট দ্বারা চালানো হয়। যেখানে পরিবর্তী প্রবাহ বা এ. সি. কারেণ্টের ব্যবস্থা থাকে সেখানে রেকটিফায়ার রেডিও ভাল্বের সাহায্যে সমপ্রবাহে পরিণত করা হয়। এই অবস্থায় গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়া কেন্দ্র থেকে আগত মিশ্র তরঙ্গ পৃথক ও বিবর্ধিত হয়। অবশেষে লাউডস্পীকারের সাহায্যে প্রেরিত শব্দের অনুরূপ শব্দ সৃষ্টি করে।

* বেতার গ্রাহক যন্ত্রে একই জায়গায় সব কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ধরা না পড়ে পৃথক পৃথক জায়গায় ধরা পড়ে কেন?

প্রচার কেন্দ্রগুলি যে বাহক তরঙ্গের মাধ্যমে সংবাদ, গানবাজনা ইত্যাদি প্রচার করে সেই বাহক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক সব কেন্দ্রের সমান নয়। অর্থাৎ একটি বেতার কেন্দ্র যে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে অন্য কেন্দ্র সেই কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে ব্যবহার করে না।

* মেঘ ডাকলে বা বিদ্যুৎ চমকালে রেডিওতে চড়চড় শব্দ করে কেন?

দুটি মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণ হলে মেঘ ডাকে। আর বিদ্যুৎক্ষরণ হলেই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এদিকে রেডিওতে যেসব অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে তাও ঐ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে। অর্থাৎ বেতার কেন্দ্র থেকে মডুলেশন করা বেতার তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রের

এরিয়্যালে ধরা পড়ে এবং গ্রাহক যন্ত্র পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত করে দেয়। কিন্তু আকাশে বিদ্যুৎক্ষরণে সৃষ্ট তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ এরিয়্যালে ধরা পড়লে অবাঞ্ছিত চড়চড় শব্দ উৎপন্ন করে।

* মাইক্রোওয়েভ কি এবং ওর সাহায্যে কিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে ?

"মাইক্রো" শব্দটির অর্থ অতি ক্ষুদ্র। তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ হলেও এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেতার তরঙ্গ অপেক্ষা অনেক কম বলে উক্ত নামকরণ। উক্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উর্ধ্বসীমা ৩০ সেমি এবং নিম্নসীমা ১ মিমি। সাধারণত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ৩ মিলিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকেই বেশী ব্যবহার করা হয়। বেতার তরঙ্গের চেয়ে এর কম্পাঙ্কও অনেক বেশী। অর্থাৎ প্রায় ১০০০ মেগাহার্ৎসেরও বেশী (১ মেগাহার্ৎস $=$ ১০^{৬} হার্ৎস)। অথচ রেডিওতে ব্যবহৃত বেতার তরঙ্গ মাত্র কয়েক মেগাহার্ৎস। তবে এও সত্য যে, বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হয় তত তার কম্পাঙ্ক বাড়তে থাকে।

অতএব মাইক্রোওয়েভও কম দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ। তবে কম্পাঙ্ক বেশী হওয়ার জন্য বেশী মাত্রায় সঙ্কেত বহন করতে সমর্থ হয়। উক্ত কারণে আজকাল জোরদার হয়েছে মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এর বড় হাতিয়ার হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ। রেডিওর মত এক্ষেত্রেও প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে।

* রেডার কি ?

রেডারের আসল নাম "Radio Detection and Ranging"। এবং অর্থ বেতারের মাধ্যমে কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয়।

এক্ষেত্রে বেতার প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে অতি শক্তিশালী বেতার তরঙ্গকে ঝলকে ঝলকে আকাশের দিকে প্রেরণ করা হয়। সেগুলি কোন কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং যেখান থেকে প্রেরিত হয় সেইখানে যন্ত্রে ধরা পড়ে। এককথায় রেডারের কাজ ঝলকে ঝলকে বেতার তরঙ্গ প্রেরণ এবং প্রতিফলিত

তরঙ্গকে গ্রহণ। বিশেষ করে শত্রুপক্ষের বিমান, জাহাজ ইত্যাদির অবস্থান রেডারের সাহায্যে নির্ণয় করা হয় এবং তাদের দূরত্ব, গতিবেগ ইত্যাদি সবই নিখুঁতভাবে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগণকে ধরা পড়ে।

অন্যান্য কাজেও রেডারকে ব্যবহার করা হয়। কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে দিগ্‌ভ্রান্ত বিমানের অবস্থান রেডারের মাধ্যমে জেনে নিয়ে বিমান-চালককে বেতারের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠানো হয়। সমুদ্রবক্ষে কেন্দ্রীভূত ঘূর্ণীঝড়ের অবস্থান নির্ণয় করে রেডার। আবার বেতার তরঙ্গ জলদ মেঘ কর্তৃক প্রতিফলিত হয় বলে রেডার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের কাজেও ব্যবহৃত হয়।

* ভ্যাকুয়াম টিউব কি ?

বায়ুশূন্য কাচ অথবা ধাতুনির্মিত কোন আধারে একাধিক তড়িৎ-দ্বার রেখে একটিমাত্র তড়িৎদ্বার থেকে আলোক তড়িৎক্রিয়ায় ইলেকট্রন প্রবাহ উৎপন্ন করে অন্যান্য তড়িৎদ্বারগুলিতে বিভিন্ন বিভব প্রয়োগ করে তড়িৎপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। অনুরূপ বায়ুশূন্য আধারই ভ্যাকুয়াম টিউব।

* ডায়োড ও ট্রায়োড কাকে বলে ?

ভ্যাকুয়াম টিউবের মধ্যে দুটি তড়িৎদ্বার থাকলে বলা হয় ডায়োড এবং তিনটি থাকলে বলা হয় ট্রায়োড। তড়িৎদ্বারের সংখ্যা চার, পাঁচ, বা আরও বেশী হলে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।

* ডায়োডের ক্যাথোড কি কারণে উৎপন্ন হয় ?

ইলেকট্রনের মুক্তির জন্য।

* ডায়োডের গঠন ও কাজ কি ?

বায়ুশূন্য ধাতু বা কাচের আধারের মধ্যে রক্ষিত ফিলামেণ্টকে ঘিরে একটি চোঙের আকারের তড়িৎদ্বার থাকে। ফিলামেণ্টের প্রান্তদ্বয় এবং তড়িৎদ্বারের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি দণ্ড আধারটির বাহিরে একটু বেরিয়ে থাকে। এদের দ্বারা ফিলামেণ্টে তড়িৎ পাঠানো হয় এবং তড়িৎদ্বারে প্রয়োজন মত বিভব প্রয়োগ করা হয়। ফিলামেণ্টকে ঘিরে

অনেক সময় একটা পৃথক ক্যাথড তথা ঋণাত্মক তড়িৎদ্বারও যুক্ত করা হয়। ফলে তড়িৎপ্রবাহ চলাকালে ফিলামেণ্ট ক্যাথডকে উত্তপ্ত করে এবং ইলেকট্রন প্রবাহ নির্গত হয়।

ডায়োডের দ্বারা এ. সি. বা পরিবর্তী প্রবাহকে ডি. সি. বা সমমুখী প্রবাহে পরিণত করা হয়। উক্ত কারণে ওদের ভালব বলা হয়।

* ট্রায়োডের গঠন ও তার কাজ কি ?

ডায়োডের ফিলামেণ্টকে ঘিরে থাকে একটি ক্যাথড এবং উপরে থাকে চোঙাকৃতি আর একটি তড়িৎদ্বার। ঐ দুই তড়িৎদ্বারের মাঝে তারজালির আকারের তৃতীয় একটি তড়িৎদ্বার ব্যবহার করলে ট্রায়োড হবে।

ট্রায়োড বিভব বিবর্ধকের কাজ করে এবং বিবর্ধনের মাত্রা অনেকাংশে বাড়ানো যায়।

* আলোক তড়িৎ কোষ কি এবং তাদের কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় ?

যে ব্যবস্থার মাধ্যমে আলোক সংকেতকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করা হয় সেই ব্যবস্থাই আলোক তড়িৎ কোষ নামে খ্যাত। এই জাতীয় কোষ তিন ধরনের হয়ে থাকে ১। আলোক নিঃসরণ কোষ, ২। আলোক বিভব কোষ, ৩। আলোক পরিবাহী কোষ।

প্রথম প্রকার কোষে কাচ অথবা কোয়ার্জের আধারে রক্ষিত ক্ষার-ধর্মী ধাতুর প্রলেপযুক্ত ধাতব ক্যাথড় ও একটি তারের অ্যানড থাকে, ক্যাথডে আলোক পড়লে আলোর তীব্রতা অনুযায়ী ইলেকট্রন স্রোত নির্গত হয় এবং আনোডের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় প্রকার কোষে আলোক পড়লে আপনা হতে বিভব প্রভেদ সৃষ্টি করে এবং তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। এতে দুটি স্তর থাকে। নিচে থাকে ধাতুর স্তর এবং উপরে থাকে অর্ধ পরিবাহীর স্তর। আর অর্ধ পরিবাহীর স্তরের একেবারে উপরে ধাতুর প্রলেপ থাকে। ঐ

প্রলেপে আলোক পড়লে অর্ধ পরিবাহীর স্তর থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে ধাতব পাতে জমা হয় ও তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় প্রকার কোষ কোন বিভব প্রভেদ সৃষ্টি করতে পারে না। ব্যাটারির মাধ্যমে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করতে হয়।

ঐসব কোষের ব্যবহার এখন ব্যাপক। প্রধান প্রধান ব্যবহারগুলি ১। সূর্যালোককে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করণ ২। টেলিভিশন ক্যামেরায় ৩। সিনেমার ফিল্মের সাউণ্ড ট্রাক থেকে শব্দের পুনর্গঠনে ৩। স্বয়ংক্রিয় আলোক উৎপাদনে, ইত্যাদিতে।

* অর্ধ পরিবাহী কি এবং কারা ?

আমরা জানি, ধাতুমাত্রেই তড়িতের সুপরিবাহী এবং কিছু কিছু পদার্থ আছে—যাদের ভেতর দিয়ে তড়িৎ চলাচল করতে পারে না। এই উভয় ধরনের পদার্থের মাঝামাঝি আর এক ধরনের পদার্থের পরিচয় পাওয়া গেছে। ওদেরই বলা হয় অর্ধপরিবাহী।

দেখা গেছে, পরিবাহীদের ক্ষেত্রে উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবাহীতা কমতে থাকে। কিন্তু অর্ধপরিবাহীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ পরমশূন্য উষ্ণতায় অর্ধপরিবাহীদের পরিবাহীতা একেবারেই শূন্য। পরমশূন্য থেকে তাপ যতই বাড়ানো যায় ততই পরিবাহীতা বাড়তে থাকে। জারমেনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতি এই জাতীয়।

* অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী কি ?

জারমেনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতি বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, গ্যালিয়াম, বোরন ইত্যাদি পদার্থকে মেশালে তড়িৎপরিবাহীতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। অনুরূপ মিশ্রিত অর্ধপরিবাহীদের বলা হয় অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী।

অ্যান্টিমনি, আর্সেনিক ইত্যাদি মেশালে অর্ধপরিবাহীতে প্রধানতঃ নেগেটিভ তড়িতাধান তড়িৎ পরিবহণে অংশগ্রহণ করে এবং এই জাতীয় অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীকে বলা হয় নেগেটিভ বা n অর্ধপরিবাহী।

গ্যালিয়াম, বোরণ প্রভৃতি মেশালে অর্ধপরিবাহী পরমাণুতে পজিটিভ গহ্বরের সৃষ্টি হয় এবং এই পজিটিভ গহ্বরগুলি তড়িৎ পরিবহণে অংশ-গ্রহণ করে বলে বলা হয় পজিটিভ বা p অর্ধপরিবাহী।

* ট্রানজিস্টর কি ?

অর্ধপরিবাহীর দ্বারা নির্মিত ট্রায়োডই ট্রানজিস্টর। সাধারণত দুটি n জাতীয় ও একটি p জাতীয় অথবা দুটি p জাতীয় ও একটি n জাতীয় অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর দ্বারা ট্রানজিস্টর তৈরী করা হয়।

ট্রানজিস্টর আয়তনে খুব ছোট ও হালকা, ওরা ভঙ্গুর নয় এবং এদের ক্রিয়াশীল করতে অতি ক্ষুদ্র শুষ্ক ব্যাটারীই যথেষ্ট। তাই এর ব্যবহার এখন ব্যাপক।

* তাপমাত্রা বাড়লে সোনা, প্ল্যাটিনাম ও সেলেনিয়ামের মধ্যে কার রোধ সবচেয়ে কম হয় ?

সেলেনিয়ামের।

* পরমাণু সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কি ?

পরমাণুকে ইংরাজীতে বলা হয় অ্যাটম (atom), আসলে এটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, যা বিভাজিত হয় না (a অর্থে না এবং tomes বিভাজন)। অর্থাৎ পদার্থের সূক্ষ্মাতিতম স্বাধীন সূক্ষ্ম কণা— যাকে ভাঙ্গাও যায় না এবং গড়াও যায় না তাকেই পরমাণু হিসাবে গণ্য করা হতো।

* পরমাণু সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কোন কোন বিজ্ঞানীর পরীক্ষা থেকে পরিবর্তিত হয় ?

রাদারফোর্ড, মাদামকুরী, নীলসবোর, জে. জে. টমসন প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা থেকে প্রাচীন ধারণা পরিবর্তিত হয়।

* পরমাণু সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা কি ?

পরমাণু অবিভাজ্য কণা নয়। হরেকরকমের কণিকা রয়েছে পরমাণুর অভ্যন্তরে। সৌরজগতে সূর্য যেমন কেন্দ্রস্থল এবং তার চারদিকে যেমন বিশাল ফাঁকা জায়গা তেমনই পরমাণুর একটি কেন্দ্রক

বা নিউক্লিয়াস থাকে। পরমাণুর সম্পূর্ণ ভর ঐ কেন্দ্রকেই কেন্দ্রীভূত এবং এটি ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট। সূর্যের চারদিকে বিশাল ফাঁকা জায়গায় যেমন গ্রহরা ঘুরতে থাকে তেমনই পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে ঋণাত্মক আধান যুক্ত ইলেকট্রনরা ঘুরে বেড়ায়। কেন্দ্রে যতটি ধনাত্মক আধানযুক্ত কণিকা থাকে কেন্দ্রের বাহিরে থাকে ঠিক ততটা ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণিকা। পরমাণুর ব্যাসকে সাধারণত $১০^{-৮}$ সেমি ধরা হয় আর তার নিউক্লিয়াসের ব্যাস $১০^{-১৩}$ সেমি।

* পরমাণুর মধ্যে প্রধান প্রধান কণিকার নাম কি ?

ধণাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন, তড়িৎনিরপেক্ষ নিউট্রন এবং ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন।

* প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেট্রনের ভর ও ব্যাসার্ধ কত ?

প্রোটনের ভর $১·৬৭২৫ \times ১০^{-১৩}$ গ্রাম এবং ব্যাসার্ধ $১·৪ \times ১০^{-১৩}$ সেমি, নিউট্রনের ভর $১·৬৭৪৮ \times ১০^{-১৩}$ গ্রাম এবং ব্যাসার্ধ $১·৪ \times ১০^{-১৩}$ সেমি, ইলেকট্রনের ভর $৯·১ \times ১০^{-২৩}$ গ্রাম এবং ব্যাসার্ধ $২·৮১৮ \times ১০^{-২৩}$ সেমি।

* প্রোটন ও ইলেট্রনের মধ্যে সম্বন্ধ কি ?

কেন্দ্রকে বা নিউক্লিয়াসে যতটি প্রোটন থাকে বাহিরের কক্ষগুলিতে ঠিক ততসংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। অথচ প্রোটন ইলেকট্রনের তুলনায় প্রায় দু'হাজার গুণ ভারী। কিন্তু উভয়ের সমান ও বিপরীত তড়িতাধান।

* প্রোটন ও ইলেকট্রনের আধান কেমন ?

প্রোটনের আধান $+১·৬ \times ১০^{-১৯}$ কুলম্ব এবং ইলেকট্রনের $-১·৬ \times ১০^{-১৯}$ কুলম্ব।

* বিভিন্ন কক্ষে কত সংখ্যক ইলেকট্রন ঘোরাঘুরি করে এবং কক্ষগুলি কোন কোন অক্ষ দিয়ে সূচিত করা হয় ?

প্রথম কক্ষে ২ দ্বিতীয় কক্ষে ৮, তৃতীয় কক্ষে ১৮, ৪র্থ কক্ষে ৩২

ইত্যাদি। সাধারণত $2n^2$ এই সূত্রের দ্বারা বিভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। nকে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদির দ্বারা প্রকাশ করলে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ প্রভৃতি কক্ষে ইলেকট্রনকে প্রকাশ করে। সর্ব শেষ কক্ষে ৮টি ইলেকট্রন থাকলে পরমাণু নিষ্ক্রিয় হয়। কিন্তু ৮টির কম থাকলে হয় সক্রিয়। তেমনই প্রথম কক্ষে ২টির পরিবর্তে ১টি থাকলে হয় সক্রিয়। কক্ষগুলিকে K. L. M. N ইত্যাদি দ্বারা সূচিত করা হয়।

* পরমাণবিক সংখ্যা কাকে বলে ?

পরমাণুর কেন্দ্রকে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে। ঐ প্রোটনের সংখ্যার উপরেই পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে।

* পারমাণবিক ভর সংখ্যা কাকে বলে ?

কেন্দ্রে অবস্থিত সম্মিলিত প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যাই পারমাণবিক ভর সংখ্যা।

* প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন ব্যতীত পরমাণুতে অন্যান্য কি কি কণিকা থাকে ?

বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগত ও তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন কোন পরমাণুতে প্রায় শতাধিক কণিকা থাকাও সম্ভব। সেগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কণিকা যথাক্রমে ইলেকট্রনের সমভরযুক্ত অথচ পজিটিভ আধানযুক্ত কণিকা পজিট্রন, প্রোটনের বিপরীত কণা অ্যান্টিপ্রোটন, নিউট্রনের বিপরীত কণা অ্যান্টিনিউট্রন, দু'ধরনের মেসন কণিকা ধনাত্মক পাইমেসন ও ঋণাত্মক মিউমেসন এবং এদেরও বিপরীত কণিকা ইত্যাদি।

* পরমাণুর মধ্যে যেসব কণিকা বিদ্যমান তাদের প্রধান কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং কি কি ?

প্রধান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। লেপটন ও হ্যাড্রন।

লেপটনদের মূল কণিকা বলে ধরা হয়েছে। ইলেকট্রন, নিউট্রিনো,

মিউমেসন কণিকা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আঘাত করলেও এরা ভাঙ্গে না।

হ্যাড্রনরা মূল কণিকা নয়। এরা লেপটনদের অপেক্ষা অনেক ভারী। প্রোটন, নিউট্রন, অ্যান্টিপ্রোটন প্রভৃতি কণিকা হ্যাড্রন শ্রেণীর। এদের বেশীরভাগই অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। মুহূর্ত মধ্যে এরা কিছুটা শক্তি সৃষ্টি করার পর ফোটন, নিউট্রিনো প্রভৃতি কণিকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

* হ্যাড্রনদের কয়টি পরিবারে বিভক্ত করা হয়েছে এবং পরিবারগুলি কি কি?

তিনটি পরিবারে বিভক্ত করা হয়েছে। বেরিওনস, অ্যান্টিবেরিওনস ও মেসনস। প্রোটন, নিউট্রন বা বেরিওনস পরিবারের, অ্যান্টিপ্রোটন অ্যান্টিনিউট্রন প্রভৃতিরা অ্যান্টিবেরিওনস পরিবারের এবং পাইমেসন প্রভৃতির মেসন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

* কোয়ার্ক কাকে বলে?

হ্যাড্রন পরিবারের সদস্যরা তিনরকম মৌলিক কণার সমন্বয়ে গঠিত বলে মনে করা হয়। ঐ মৌলিক কণিকাগুলিকে কোয়ার্ক নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তবে মেসনদের মধ্যে তিনটি কণা নেই। একটিমাত্র কোয়ার্ক কণা এবং একটিমাত্র অ্যান্টিকোয়ার্ক কণা দিয়ে গঠিত।

* প্রতিবস্তু কি?

পার্থিব বস্তুর পরমাণু সাধারণত ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নিয়ে গঠিত। উক্ত কণিকাদের বিপরীত কণা তথা পজিট্রন, অ্যান্টিপ্রোটন ও অ্যান্টিনিউট্রন দিয়ে গড়া বস্তু হলে তাকে অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতিবস্তু বলা হবে। পার্থিব বস্তুর সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। এমন বস্তু পৃথিবীতে নেই। পার্থিব বস্তুর সঙ্গে যদি মিলিত হয় তাহলে উভয়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং নির্গত হবে শক্তি।

* তেজস্ক্রিয় পদার্থ কাদের বলা হয়?

ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ভারী ধাতুগুলি থেকে আলো কিংবা অন্ধকারে যে কোন অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক রকমের রশ্মি বিকীর্ণ হয়। উক্ত রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে প্রভাবিত করে। সাধারণ আলোক রশ্মি অপেক্ষা এদের ভেদন ক্ষমতাও অনেক বেশী। যেসব পদার্থ থেকে অনুরূপ রশ্মি নির্গত হয় তাদেরই বলা হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং এই রশ্মি নির্গমন ক্রিয়াকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা।

* α রশ্মি, β রশ্মি ও γ রশ্মি কারা ?

তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থেকে বিকিরিত রশ্মিকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় এক ধরনের রশ্মি ধনাত্মক তড়িৎসম্পন্ন আর এক ধরনের রশ্মি ঋণাত্মক তড়িৎসম্পন্ন এবং তৃতীয় তড়িৎবিহীন কতকগুলি রশ্মি। প্রথম ধরনের রশ্মিকে α (আলফা) রশ্মি, দ্বিতীয় ধরনের রশ্মিকে β (বিটা) রশ্মি এবং তৃতীয় ধরনের রশ্মিকে γ (গামা) রশ্মি বলা হয়। α রশ্মিদের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১.৪৫×১০^{৯} সেমি. থেকে ২.২×১০^{৯} সেমির মত এবং ভর একটি হিলিয়াম পরমাণুর ভরের সমান। β রশ্মি পরমাণু কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন ছাড়া কিছু নয়। আর γ রশ্মি আলোক রশ্মি, এক্স রশ্মি প্রভৃতির মত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $১০^{-৩}$ সেমি থেকে $১০^{-১১}$ সেমির মত এবং এর ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। ৩০ সেমি পুরু লোহার পাতকেও অক্লেশে ভেদ করে যেতে পারে।

* মৌলিক পদার্থের রূপান্তর কি সম্ভব ?

হ্যাঁ। যে কোন সুস্থিত মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসকে উচ্চশক্তি-সম্পন্ন কোন কণা তথা আলফা কণা প্রভৃতির দ্বারা আঘাত করলে মৌলিক পদার্থের পরমাণু ভেঙে যায় এবং একাধিক মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

* কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা কি ?

তেজস্ক্রিয় নয় এমন সব মৌলিক পদার্থকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আলফা কণিকা, নিউট্রন, প্রোটন ইত্যাদির দ্বারা আঘাত করলে পদার্থটি

সাময়িকভাবে তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। উক্ত প্রক্রিয়াকে বলা হয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা।

* নিউক্লীয় বিভাজন কি ?

ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতুর পরমাণুকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে দুটি প্রায় সমান আকারের খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় এবং উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণ শক্তি। উক্ত ঘটনাকে বলা হয় নিউক্লীয় বিভাজন।

* নিউক্লীয় সংযোজন কি ?

অত্যধিক তাপমাত্রায় তথা কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রী উষ্ণতায় বিভিন্ন ভরের হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোকে সংযুক্ত করলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে এবং নির্গত হয় প্রচণ্ড শক্তি। উক্ত প্রক্রিয়া নিউক্লীয় সংযোজন নামে খ্যাত।

* প্রতিপ্রভ (Fluorescent) পদার্থ কি ?

কোন কোন পদার্থের উপর বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কোন আলোক আপতিত হলে পদার্থটি আলোক শোষণ করে নিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোককে বিকিরণ করতে থাকে। আরও দেখা গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আলোক পদার্থটির উপর আপতিত হয় ঠিক ততক্ষণই বিকিরণ করে দীর্ঘ তরঙ্গের আলো। অনুরূপ স্বভাব বিশিষ্ট পদার্থকে বলা হয় প্রতিপ্রভ পদার্থ। বেরিয়াম প্লাটিনো সায়ানাইড, জিঙ্ক সালফাইড প্রভৃতি এই জাতীয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অতি বেগুনী রশ্মি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। কিন্তু প্রতিপ্রভ পদার্থের উপর আপতিত হলে দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করে।

* অনুপ্রভ (Phosphorescent) পদার্থ কাকে বলে ?

যে সমস্ত পদার্থের উপর আলোক আপতিত হলে পদার্থগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক বিকিরণ করে এবং আলোক আপতন বন্ধ হলেও কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত আলোক

বিকিরিত হয়, এদেরই বলা হয় অনুপ্রভ পদার্থ। বেরিয়াম সালফাইড, ক্যালসিয়াম সালফাইড ও ষ্ট্রনসিয়াম সালফাইড প্রভৃতি এই জাতীয়।

প্রতিপ্রভ ও অনুপ্রভ উভয় ধরনের বস্তুগুলির উপর আলোক আপতিত হলে বস্তুগুলির পরমাণুরা ঐ আলোককে শোষণ করে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠে। তারপর উত্তেজিত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সময় দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক বিকিরণ করে। প্রতিপ্রভ বস্তুগুলি উত্তেজিত হয়ে বেশীক্ষণ উচ্চশক্তি স্তরে থাকতে পারে না, কিন্তু অনুপ্রভ বস্তুগুলি পারে; তাই ঘড়ির কাঁটা প্রভৃতিতে ওদের প্রলেপ দিলে অন্ধকারেও উজ্জ্বল দেখায়।

* পদার্থ বিজ্ঞানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ও আবিষ্কারক।

দূরবীন—লিপারসে, গ্যালিলিও।
অণুবীক্ষণ যন্ত্র—লিউয়েন হোয়েক
তড়িতাহিতকরণ (১৬০০)—গিলবার্ট
ব্যারোমিটার (১৬৪৩)—টরিসেলি
বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র (১৬৫০)—আটাভন গেরিক।
পেণ্ডুলামযুক্ত ঘড়ি (১৬৫৬)—হাইগেন্স
থার্মোমিটার (১৭১৪)—ফারেন হাইট
স্টীম ইঞ্জিন (১৭৬৫)—জেমস ওয়াট
সুতাকাটার কল (১৭৬৭)—হারগ্রীবস
বেলুন (১৭৮৩)—মণ্টগলফ্ ইয়ার ব্রাদার্স
প্রবাহী তড়িৎ (১৭৮৬)—গ্যালভানি
তড়িৎ কোষ (১৮০০)—ভোল্টা
সেফ্টি ল্যাম্প (১৮১৬)—হামফ্রে ডেভি
তড়িৎ ও চুম্বকের সম্পর্ক (১৮২০)—ওরস্টেড
তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ (১৮৩১)—ফ্যারাডে
জেনারেটর (১৮৩১) ফ্যারাডে
টেলিগ্রাফ (১৮৩২) স্যামুয়েল মোর্স
তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্র (১৮৩৩)—ফ্যারাডে
তড়িৎপ্রবাহের তাপীয় ফল (১৮৪১)—জুল
স্পেকট্রোস্কোপ (১৮৫৯)—কিরসপ
ডায়নামো (১৮৬০)—পিকিপট্টি
তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-তত্ত্ব (১৮৬৪)—ম্যাক্সওয়েল
আলোকের কণিকা-তত্ত্ব—নিউটন

ইলেকট্রিক বাল্ব (১৮৭০)—এডিসন
বেতার-তরঙ্গ (১৮৭৭)—হার্ৎস
পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে তত্ত্ব—নীলসবোর
টেলিফোন (১৮৭৬)—গ্রেহাম বেল
মাইক্রোফোন (১৮৭৭)—বারলাইনার
ফনোগ্রাফ (১৮৭৭)—এডিসন
গ্রামোফান (১৮৮৭)—বারলাইনার।
রঙিন ফটোগ্রাফি (১৮৯১)—লিপম্যান
সাবমেরিন (১৮৯১)—পি. হল্যাণ্ড
ইলেকট্রিক মোটর (১৮৯২)—সিকোলা তেসলা
মুভি প্রোজেকটর (১৮৯৩)—এডিসন
ডিজেল ইঞ্জিন (১৮৯৫)—রুডলফ ডিজেল
রেডিও (১৮৯৫)—মার্কনি
এক্সরে (১৮৯৫)—রয়েণ্টজেন
ইলেকট্রন (১৮৯৭)—জে. জে. টমসন
এরোপ্লেন (১৯০৩)—রাইট ভ্রাতৃদ্বয়
ভ্যাকুয়াম টিউব—এল. ভি. ফরেস্ট
রেডার (১৯২২)—টেলার ইয়ং
আয়নোস্কোপ (১৯২৩)—জোরিকিন
লাউড্স্পীকার (১৯২৪)—পিনকেলর
টেলিভিশন (১৯২৬)—বেয়ার্ড
সাইক্লোট্রন (১৯৩১)—ই. ও. লরেন্স
হেলিকপ্টার (১৯৩৯)—সিবরসকি
নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর (১৯৪২)—ফার্মি
উদস্থিতি বিদ্যা—আর্কিমিদিস
স্থিতিবিদ্যা—গ্যালিলিও
মহাকর্ষ শক্তি—নিউটন
ধূম্রকক্ষ—উইলসন

আলোকের তরঙ্গ-তত্ত্ব—হাইগেন্স
গামারশ্মি (১৯০০)—ভিলার্ড
মহাজাগতিক রশ্মি (১৯০০)—হেস ও এণ্ডারসন
কোয়ান্টাম তত্ত্ব—ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক
প্রোটন কণিকা (১৯১৪)—রাদারফোর্ড
মেসন কণিকা (১৯০০)—য়ুকাওয়া
আইসোটোপ (১৯১১)—জে. জে. টমসন
মৌলের রূপান্তর (১৯১৯)—রাদারফোর্ড
পজিট্রন (১৯৩২)—অ্যাণ্ডারসন
নিউট্রন (১৯৩২)—চ্যাডউইক
আপেক্ষিকবাদ (১৯০৬)—আইনস্টাইন
বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র (১৯০৬)—মাইকেলসন
তাপ বিকিরণ-তত্ত্ব—কার্লভার্ণার ও ওয়েইন
রামন এফেক্ট—চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন
কোয়ান্টাম মেকানিক্স—হাইসেনবার্গ
ফেজকনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ—জার্নিক
ট্রানজিস্টার—শকলে, বার্ডিন ও ব্রেটেন
অ্যান্টিপ্রোটন কণিকা—সেগরে ও চেম্বারলেন
মোসবাউয়ার এফেক্ট—আর. এল. মোসবাউ
পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কণিকার শ্রেণীবিভাগ —গেল মান।
হলোগ্রাফ—ডেনিসগাবর
অতিপরিবাহিতা তত্ত্ব—বার্ডিন, কুপার ও শ্রিফার
